KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Card No : KLMLGK 200	Place of Publication 28 মোহিনী রোড, কলকাতা-২৬
Collection : KLMLG	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number 2৬/- 2৬/- 2৮/-	Year of Publication বৈশাখ ১৩৮৫ ॥ April-May 1978 শ্রাবণ ১৩৮৫ ॥ Aug 1978 কার্তিক ১৩৮৫ ॥ Nov 1978
	Condition Brittle Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C D Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

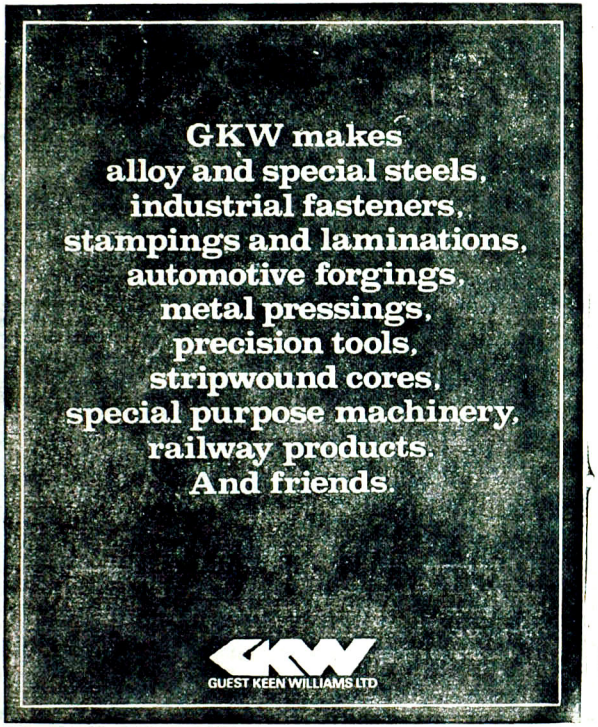

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ৯ বৈশাখ তেরশ' পঁচাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচিপত্র

সঙ্গীতসাধক অমিয়নাথ সান্যাল ॥ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৯

পাশের রাজ্যে লৌকিক দেব-দেবী : বিহার ॥ ভোলানাথ ভট্টাচার্য ১৫

অরুণাচলের লোকনীতি ॥ অশোককুমার বসু ১৯

বনমহোৎসবের আদিপর্বে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ২৩

সৌর বসায়ন ॥ হেমন্তকুমার সরকার ২৯

সমালোচনা : ভারত চীন ও চীন ভারত পরিব্রাজকবৃন্দ ॥ সন্তোষকুমার বসু ৩৫

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

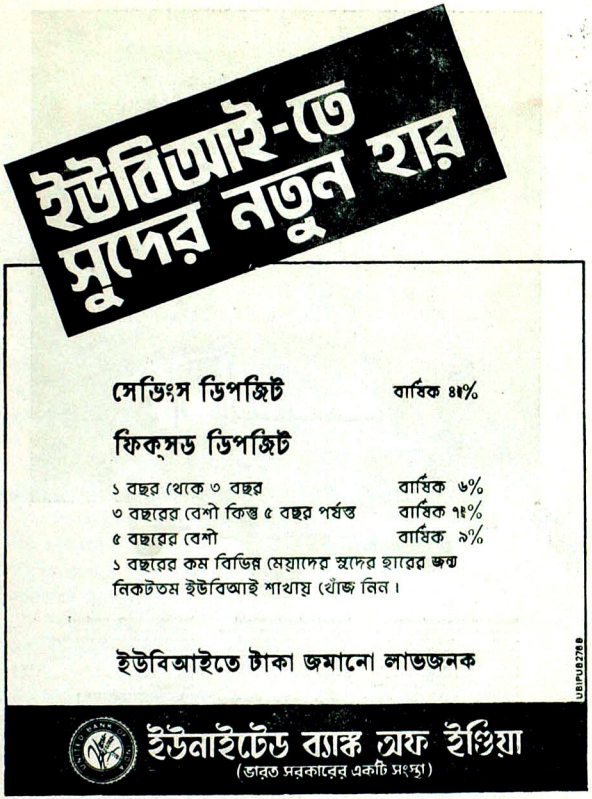

সমকালীন

বর্ষ ২৬ বৈশাখ ১৩৮৫

সঙ্গীতসাধক অমিয়নাথ সান্যাল

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

তখন ইংরাজী ১৯৩১—৩২ সাল। কৃষ্ণনগরে স্কুলে পড়ি। প্রায়ই দেখতুম অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের পিতা দীননাথ সান্যাল মহাশয় আমার ঠাকুর্দা হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। গল্পের বিষয়বস্তুর অনামান্য পরিধি ছিল। সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিখুঁত ও সুদূরপ্রসারী যুক্তিগুলো মনে বেশ দাগ কাটতো আর—সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ মতামতগুলো শুনলেও কিছুই বুঝতুম না। সেই সময়ের কথা ভাবলেই কিন্তু এখন বুঝতে পারি অমিয়নাথের পরিশীলিত মননের উৎস কোথায়।

বোধহয় ১৯৩৭ সাল হবে যখন প্রথম অমিয়নাথকে সামনা সামনি দেখি এবং তাঁর সঙ্গীতমত্ততার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের বাড়ীতে গানবাজনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং পিতৃদেবের কণ্ঠে হিন্দী ধ্রুপদ ও ধামার গান শুনে প্রথম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার উৎসাহ জাগে। প্রায়ই সহরের ছোট খাটো সঙ্গীতের আসরে হাজিরা দিতুম। এমনই একটি আসরে অমিয়নাথকে প্রথম দেখি। কথা হচ্ছিল বাংলা টপ্‌পা গান প্রসঙ্গে। অমিয়নাথ গুণগুণ করে গান ধরলেন 'সোহাগে মৃণাল ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে' গানখানি যা আমি পিতৃদেবের কণ্ঠে আগেই শুনেছি। তারপর এসরাজ খানি তুলে নিয়ে গানটি বাজাতে আরম্ভ করলেন। বাজনার সময় চোখে মুখে একটা পরম পরিতৃপ্তির ছাপ লক্ষ্য করেছিলুম। হাতের ছড় আর বাঁহাতের সরু আঙুলগুলো এসরাজকে যেন কথা বলিয়ে দিচ্ছিল। উপস্থিত জন দশেক শ্রোতা সকলেই দেখলুম অর্ধনিমীলিত চোখে ঘাড় নেড়ে উপভোগ করছেন। ছড় আর আঙুলের কারচুপির ফলে টপ্‌পার জম্‌-জমা তানগুলো থাপ্পাজের ছকের মধ্যে অনায়াসে ঘোরাফেরা করছে। বাজনা শেষ হলে আবার গান শোনার গল্প এবং তারই মাঝে মাঝে

কথন বা গান বা বাজানো। এমনি করে গানের 'আসর' নয়,—গানের 'আড্ডা' সেদিন বেশ জমে উঠেছিল। এই ধরণের আড্ডায় আমি প্রথমে কৃষ্ণনগরে এবং পরে এই কলকাতা সহরে প্রায় নিয়মিত হাজিরা দিয়ে এসেছি। তাঁর মৃত্যুর পর তাই আমার সবচেয়ে প্রথম মনে পড়ছে এই আড্ডার কথা যেখানে বসে অনেক শুনেছি এবং অনেক শিখেছি। তাঁর সঙ্গীত জগতের কথা তাঁরই মুখে যা শুনেছি তাই আজ আমি বলতে চাই।

সিভিল সার্জন দীননাথ সান্যালের মেজছেলে অমিয়নাথের ১৮৯৫ সালে জন্ম হয়। জন্ম অবধি অমিয়নাথ পিতার সঙ্গে উত্তরভারতে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন এবং সঙ্গীতরসিক পিতৃদেবের সঙ্গে অনেক 'মাইফেলের' আসরে গিয়েছেন। আই এস সি পাশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঙ্গলীরেজিমেণ্টের সঙ্গে তিনি মেসোপটেমিয়া যান। ১৯১৯ সালে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরেএসে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে থাকেন। সার্জারীতে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল যদি ও মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রি নেবার শেষ পরীক্ষা তিনি দেন নি। তাঁর স্বভাবসুলভ হাল্‌কা চালে আমাকে একবার বলেছিলেন যে গানের সমঝদারী করবার জন্যে যে পোষ্টমর্টেম করার দরকার তার প্রথম তালিম তিনি পেয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজে আর দ্বিতীয় তালিম অবশ্য গুরুজী শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছ থেকে। আর গানবাজনার ক্ষেত্রে সুর ও তানের ব্যবহার হোমিওপ্যাথিক ডোজেই যথার্থ আর্ট। এটা অবশ্য উত্তরকালে তার হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি লাভ করার স্বপক্ষে সরস বাক্যালাপ বলে মনে হলেও শিল্প বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে একটা যথার্থ তুলনা বটে।

কলকাতায় স্কটিশ কলেজে আই এস সি পড়বার সময় এবং পরে মেডিক্যাল কলেজে ও হোমিও কলেজে পড়বার সময় ৬নং ল্যান্সডাউন রোডে নাটোরের মহারাজার বাড়ীতে আর হ্যারিসন রোডে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ীতে বড় বড় গাইয়েদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। একদিকে যেমনি তখন অনেক গান বাজনা শুনেছেন অন্যদিকে তেমনি বদল খাঁ এবং বিষ্ণুপুর রাও প্রমুখ মহামহা খেয়ালী, ধ্রুপদীয়া বা ধামারীদের কাছ থেকেও সেই সময় সঙ্গীত জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কিছু তালিমও নিয়েছেন। এছাড়া তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে থাকাকালীন তাঁদের বাড়ীতেও গান বাজনার আসর বসত প্রতি পূর্ণিমার রাতে। সেখানে ভেলুবাবু অর্থাৎ পিতৃবন্ধু শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে এসরাজ বাজনায় অমিয়নাথ উৎসাহ লাভ করেন। সে সময় দিশী গানের আসরগুলো কৃষ্ণনগরে ছিল জমজমাট। সুতরাং সবরকম গানের 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'-য় তাঁর মন গানের সুরে বেঁধে গিয়েছিল। তাঁর এই কথাটার তাৎপর্য এবার বলি।

সকলেই জানেন যে অমিয়নাথ আমাদের দেশের তথাকথিত 'উচ্চাঙ্গসঙ্গীত' নিয়েই সমঝদারী করেন। এদিকে গানের আড্ডায় বসে ভাল খাম্বাজ গান বলতে তানসেনের বিখ্যাত ধ্রুপদ গান 'বংশী ধুন সো বজায়ী' গানের সঙ্গে থিয়েটারের গান 'চেওনা চেওনা এদিকে চেওনা' প্রচুর রস দিয়ে গাইতেন। এমনি করে খট্ সুরে এ মায়া প্রপঞ্চময়ী, দেওগিরী সুরের আগমনী গান 'গা তোল গা তোলো বাঁধ মা কুণ্ডল,' গোবিন্দ দাসের 'অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন' বা ক্যালেণ্ডারায় বাঁধা 'বিদ্যাসুন্দর' পালার 'ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার' ইত্যাদি গান গেয়ে বৈজু, তানসেন অদারঙ্গ, সদারঙ্গ ইত্যাদি মহারথীদের লেখা গানগুলোর সঙ্গে পাশাপাশি পাল্লা দেওয়াতেন।

এমনি করে সঙ্গীত প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত রেখে প্রাথমিক তালিম নেবার পর ভারতীয় শিল্প সৌন্দর্য তত্ত্ব বিষয়ে অমিয়নাথ ১৯৩৭ সাল থেকে মূল সংস্কৃত বইগুলি পড়তে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মনের মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসা জড়ো হয়েছে এবং নিজের সঙ্গীতমন্তব্য দিয়ে কিছুটা নিষ্পত্তি ও হয়েছে। এবং তিনি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গুলোর সমর্থন এইসব গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পেয়ে অবাক হয়েছেন। তিনি বারবার বিনয় করে বলতেন যে তখনকার সঙ্গীতগুণীদের সঙ্গে কথা বলে একথা স্থির বুঝেছিলেন যে তাঁর মতামত গুলো কিছু নতুন আবিষ্কার নয়,—তা হোল হারানো মানিক খুঁজে পাওয়া মাত্র।

এ কথা সবাই জানেন যে ধর্মোপাসনার মতন ভারতীয় রাগ সঙ্গীত অনুশীলন পদ্ধতিও গুরুমুখী। অমিয়নাথ বলতেন যে শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি নয়,—সমঝদারীর জন্যও শিক্ষাগুরুর কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। তাঁর ইংরাজী লেখা রাগ রাগিণী সম্বন্ধে গবেষণামূলক বইখানি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময় একদিন আমি 'মেরু', 'খণ্ডমেরু' এবং 'মাতৃকা' এই তিনটি শব্দের উৎস জানতে চাই। কারণ সমগ্র বইখানিতে রাগ রাগিণীর বিচার প্রসঙ্গে এই তিনটি শব্দই বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রচলিত মেল, ঠাট, আরোহী, অবরোহী জনক-জন্য, উত্তরাঙ্গ-পূর্বাঙ্গ, ওড়ব-ষাড়ব প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি রাগ রাগিণী বিচার প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়নি বললেই হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে অমিয়নাথ বলেছিলেন যে তিনি গুরু শ্যামলালজীর কাছে থেকেই এই সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং শ্যামলালজীও এ সম্বন্ধে তাঁর গুরু গণেশলালজীর কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন।

বালীগঞ্জে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে ১৯৫৭-৬০ সালে সপ্তাহে দুদিন করে অমিয়নাথের ঘরোয়া বৈঠক জমত। সুরেশদা ছিলেন এই আসরের প্রধান হোতা কারণ তিনিই অমিয়নাথকে তাঁর বাড়ীতে সপ্তাহের দুদিন করে ধরে রাখতেন। সেখানে আমি ছাড়া প্রায় নিয়মিত হাজিরা দিতেন অমিয়নাথের আবাল্য সুহৃদ সঙ্গীত রসিক ডাঃ হরিচরণ দত্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী ও শ্রীজিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে সুগায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও শুভাগমন ঘটত। অনেক গান ও গল্পের অবতারণা করা হয়েছিল এই আসরগুলিতে তার মধ্যে দু একটা বলা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অমিয়নাথ বলতেন যে বদল খাঁ সাহেবের কাছ থেকে শেখা গানের স্থায়ীগুলো শুনলে বোঝা যায় যে তার গঠন প্রকৃতির বৈশিষ্টের জন্য কতখানি সঙ্গীতমত্ততা প্রয়োজন হয়। বিখ্যাত গানের স্থায়ীগুলো তিনি প্রায়ই মুখে মুখে ভাঁজতেন আর সুরেশদার কাজ ছিল তৎক্ষণাৎ সেগুলো স্বরলিপিতে ধরে রাখা। একদিন তিনি কলকাতার সেতারী হাকিমঘর কাছ থেকে শেখা 'ভোলেরে যোবন মদমাতি' গানখানি 'পুরিয়া' রাগের মাধ্যমে শোনান। পরে খেয়ালী মৌজুদ্দিনের গলায় সুরের ঈষৎ হেরফের করে শোনা ওই গানখানি নতুন করে শুনিয়ে দেখিয়ে দেন যে তিনি কেমন করে মৌজুদ্দিনের গলায় 'ভোলেরে' এই কথা ও তার সুরপ্রয়োগের মধ্যে সমগ্র গানখানির ছন্দ ও ব্যঞ্জনা নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন।

আর একদিনের কথা। যথারীতি বদল খাঁ সাহেবের গানের একটি স্থায়ী অংশ শুনছি এবং সুরেশদা টুকে নিচ্ছেন তার স্বরলিপি। অংশটুকু মনে হল যেন হীরের টুকরো একখানা, যেটা পাকা

জহুরী অনেক ঘষে মেজে তার চমক বের করছে। বুঝলুম গানখানির সুরকার নিশ্চয়ই একজন সত্যিকারের গুণী। স্থায়ী অংশ শেষ হতে অন্তরাটুকুও শুনতে চাইলুম। অমিয়নাথ ততক্ষণ প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বললেন 'গান তো অনেক শুনেছ। গান দেখেছ কি?' বুঝলুম হেঁয়ালীর ভাষা। ঘাড় নেড়ে বোঝালুম যে দেখি নি। তখন অমিয়নাথ বেনারসের মোতিবাঈয়ের কাছে শোনা আড়ানায় বাঁধা 'মুদরী মোর কাহে ছিন্ লয়ে' গানখানি শোনালেন। বিপ্রলব্ধা প্রেমিকার কাতরোক্তি 'আমার অভিজ্ঞানের অংশটি তুমি কেন খুলে নিলে।' মধ্যম পঞ্চম ও কোমল গান্ধারের ওপোর ছোট ছোট মুড়কি তান ও ঠোক দিয়ে পরে 'কাহে' কথাটার উচ্চারণের সময় যখন পঞ্চম থেকে তার ষড়জে গিয়ে মীড় দিয়ে কোমল নিখাদ ছুঁয়ে পঞ্চমে দাঁড়ালেন তখনই গানখানির মধ্যে অভিমানের কাতরোক্তি স্পষ্ট ফুটে উঠলো। আর পঞ্চমের স্পর্শে হল মূল রস শৃঙ্গারের প্রতিষ্ঠা। গান শেষ হতে আমার মতামত জানালুম। বললেন 'হ্যাঁ সোনবার কান তৈরী হয়েছে অনেকটা। মোতি বাঈয়ের গলায় অবশ্য আমি অনেক বেশী কিছু শুনেছিলুম এবং সেই সঙ্গে দেখেছিলুম বাঈজীর অভিমান ভরে থরথর করে কাঁপা ঠোঁট দিয়ে সেই কথাগুলো বলবার ভঙ্গী আর জলভরা ছলছল নত চোখের কাজল ভরা চাহনী। এখন বোঝ গান কি করে দেখতে হয়।'

অমিয়নাথ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সঙ্গীতের প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী সুলভ মতামত গুলো। তখন বোধহয় পঞ্চাশসাল। একদিকে হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক উত্থান। অন্যদিকে ওস্তাদদের মুখে মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিন্দা। অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ রাগ সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধকে ঘিরে অনেকেই সোচ্চার। কৃষ্ণনগরে অমিয়নাথের বৈঠকখানায় কয়েকজন স্বানীয় ওস্তাদজমায়েত হয়েছেন। তাঁরা একযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আক্রমণ করছেন এবং সুরসিক বীরেনদা,—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য,—অভিমন্যুর মতন একাই লড়ে যাচ্ছেন। এমন সময় অমিয়নাথ আমাকে রবীন্দ্রনাথের 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' গানখানি চতুর্মাত্রিক তালে গাইতে বললেন। গান শেষ হলে তিনি খাতা কলম নিয়ে একটা স্বরলিপি করে আমাকে দেখিয়ে নিলেন এবং তারপর কি একটা হিসাব কষে নিয়ে বললেন যে গানখানিতে যে রাগের ব্যবহার হয়েছে তাঁর নামকরণ হোক 'মালব-কল্যাণী' এই বলে প্রায় ৫।৭ মিনিট ধরে ঐ রাগে আলাপ করলেন। ওস্তাদদের তখন মুখচুপ। সমস্ত তর্ক যুদ্ধের সমাপ্তি সেদিন ওইখানেই হবার কথা কিন্তু অমিয়নাথ তখনও থামেন নি। একটার পর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত উল্লেখ করেন আর সুর বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে থাকেন যেমন বেহাগে বাঁধা 'দীপ নিভে গেছে মম' গানখানিতে কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য। 'এবার অবগুণ্ঠন খোল' গানখানির মধ্যে ছন্দের বাঁধুনী আর মল্লারের দীপ্তি। বাঙলার মেঠো সুরে বাঁধা 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানখানি কোমল রেখাবের প্রয়োগ ঘিরে অভিমানের ছায়া; কোমল ধৈবতের পাল তুলে 'কবে তুমি আসবে বলে' গানটিতে নীল আকাশের সাগরে শুক্লা একাদশী চাঁদের খেয়াপাড়ি দেওয়া। আর কত বলব? সকলেই তখন অবাক বিস্ময়ে শ্যামলালজী বদল খাঁ সাহেব বিশ্বনাথ রাও ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়া অমিয়নাথের কাছে যেন ভূতের গল্প শুনছেন। সব কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেলে অমিয়নাথ সেদিন, হঠাৎ চুপ করে গেলেন তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন 'এক ওড়ব শ্রেণীর রাগই

৫০০ শত সংখ্যার ওপর হওয়া সম্ভব। তারপর ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতির রাগ রাগিণীর সংখ্যা কত হতে পারে বুঝে দেখ। রাগ রাগিণী সিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করবার আগে যদি এই উপলব্ধি সকলের হোত তো এতদিনে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের সুরকার ও সঙ্গীতকারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন।'

সঙ্গীত সম্বন্ধে অমিয়নাথের মনন ছিল সংস্কার মুক্ত। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র মতঙ্গের বৃহদ্দেশী বা নারদকৃত সঙ্গীত মকরন্দ ইত্যাদি সংস্কৃত বইগুলি তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পড়ে ছিলেন অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সঙ্গীত তত্ত্ববিদদের লেখাও বাদ দেননি কিন্তু কারও মতামত তিনি অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করেন নি। তারই ফলে তার নাট্যশাস্ত্রের ওপর লেখা এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতগুলি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশ পত্রিকার ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অমিয়নাথের লেখা বইয়ের ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। যেটুকু আমার দেখা তাতে মনে হয় যে তাঁর নিজের সংরক্ষিত অপ্রকাশিত লেখাগুলির সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। দুঃখের বিষয় যে সেগুলি এখন খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। শ্রদ্ধেয় সুরেশদার চেষ্টায় তাঁর কাছ থেকে ইংরাজীতে লেখা রাগালাপ সংক্রান্ত একখানি বই প্রকাশ করবার সম্মতি একজন প্রকাশক আদায় করতে পেরেছিলেন এবং তার কিয়দংশ অমিয়নাথ নিজেই প্রুফ্ সংশোধন করেছিলেন। এই অমূল্য বইখানি প্রকাশিত হলে রাগ সঙ্গীত জগতে যে এক বিশেষ সংযোজন বলে পরিগণিত হবে এ বিশ্বাস আমি রাখি।

অমিয়নাথের যতগুলি লেখা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ইংরাজীতে লেখা 'রাগ ও রাগিণী' এবং নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা হিসাবে লেখা ও কয়েকটি 'সমকালীন' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা এগুলি কোনও সঙ্গীত বিষয়ে লেখা বইয়ের চর্বিত চর্বণ নয় অথচ মতামতগুলি আমাদের রাগ সঙ্গীত সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান ধারণাগুলোকে কিছুটা ওলোট পালট করে দিয়ে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারে।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রখানির বঙ্গানুবাদ অমিয়নাথের অপ্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই বইখানির ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কিছুটা ধারাবাহিক ভাবে সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কয়টি রচনা পড়লেই বোঝা যায় যে এ পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রের ওপর ইংরাজী বা বাংলায় যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ভাষ্য এতাবৎকাল প্রামাণ্য বলেই চলে আসছে। সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য বিষয়ক এই বইখানির বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় অমিয়নাথ দেখিয়েছেন যে ভারতীয় সঙ্গীত নাটক ও নৃত্য পরিবেশন পদ্ধতিও সে সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ধ্যান ধারণাগুলি পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম এবং নির্ভুল। নৃত্য-নাট্য, সিম্ফনী অর্কেষ্ট্রা, অপেরা বা স্ত্রী পুরুষের হাত ধরাধরি করে যুগল নৃত্য ইত্যাদির প্রয়োগ পদ্ধতি নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেই রয়েছে অথচ তার ভ্রমাত্মক অনুবাদের ফলে যথাযথ ভাবে নাট্যশাস্ত্রের অনুশীলনও এ পর্যন্ত হয় নি।

ইংরাজীতে রাগ ও রাগিণী সম্পর্কে লেখা বইখানির মধ্যে অমিয়নাথের বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিগুলো যে চমকপ্রদ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। বইখানি প্রকাশ করার আগে অমিয়নাথ

তাঁর সুহৃদ জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়কে বইখানি দেখতে অনুরোধ করেন। আদ্যোপান্ত পড়বার পর বসু মহাশয় অমিয়নাথকে এই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। অসংখ্য গান ও বাজনার স্বরলিপিগুলি বিশ্লেষণ করে অমিয়নাথ কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যেগুলি প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধবাদী। কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য সিদ্ধান্তের কথা এখানে বলবার প্রয়োজন বলে মনে হয়।

১। রাগ বা রাগিণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদের লক্ষণ নির্ধারণ।

২। যে কোন ও একটি গানের রাগ বা রাগিণীর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে ন্যূনপক্ষে চারটি স্বরের যে কোনওটি বাদীস্বর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

৩। রাগ বা রাগিণীকে সঠিক সনাক্ত করতে হলে আরোহী, অবরোহী, মেল. ঠাট, পকড় বা থাস তানের লক্ষণগুলির চেয়েও বাদীস্বর, খণ্ডমেরু বা মাতৃকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার অনেক বেশী কার্যকারী।

৪। ইংরাজী 'মেলডী' আর ভারতীয় রাগরাগিণীর পরিবেশন পদ্ধতির পার্থক্য কোথায় তার নির্দেশ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে সারা পৃথিবীর সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

৫। রাগ রাগিণীর জন্ম যে একান্তভাবে 'মাতৃকা' ও 'খণ্ডমেরুর' যথাযথ প্রয়োগ নির্ভর সেকথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অমিয়নাথ সম্পর্কে এতগুলি কথা বলার পরও মনে হচ্ছে যে কথা বলার প্রয়োজন সেকথা জোর গলায় বলা হল না এবং এপর্যন্ত হয় নি। তার কারণ প্রথমতঃ এই যে তাঁর সঙ্গীতমগ্নতার পরিমাপ করা আমাদের মতন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের কণ্ঠনিনাদে কর্ণপাত করবার মতন এমন কোনও নামকরা মহারথীদের খবর পাইনি যিনি তাঁর লেখাগুলি সম্যক ভাবে পড়েছেন ও অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া একথাও সত্যি যে বইগুলি পড়তে চাইলেও বাজারে পাওয়া যায় না কারণ আগের মুদ্রণগুলি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি 'স্মৃতির অতলে' বইখানি শ্রীশ্রীশকুন্তু মহাশয় ও সুরেশদার যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রকাশিত হয়েছে এবং আশা করছি যে অন্যান্য বইগুলির পুনর্মুদ্রণ ও পত্রিকার লেখাগুলি বইয়ের আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

১৯৭৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী অমিয়নাথ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সেই সঙ্গে যদি তাঁর বইগুলির পুনর্মুদ্রণ বা অপ্রকাশিত লেখাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব না হয় তাহলে বুঝতে হবে ভারতীয় রাগসঙ্গীত জগতের একটি অপূরণীয় ক্ষতি হল।

পাশের রাজ্যে লৌকিক দেব-দেবী ঃ বিহার

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

লোকসমাজের দেব-দেবী পৌরাণিক দেব-দেবীদের মতো অনেক সময়ে নিজের অধিষ্ঠানক্ষেত্র বিস্তৃত করতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়েছেন এমন উদাহরণ বেশকিছু মিলতে পারে। কখনো কখনো দেখা যায় কোন লৌকিক দেব বা দেবী একই সঙ্গে দুটি বা তিনটি রাজ্যে পূজিত হচ্ছেন। হয়ত সেই পূজার কৃত্যাদিতে সামান্য পার্থক্য ঘটে। পশ্চিম বাঙলার প্রতিবাসীরাজ্য বিহার, ওড়িশা এবং আসামে সন্ধান করলে লৌকিক দেব-দেবী সংক্রান্ত পারস্পরিক প্রভাবের কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিছু সংখ্যক দেব-দেবী দেখা যায় যাঁর প্রভাব-সীমা ছোট্ট একটি অঞ্চলের মধ্যে বদ্ধ, হয়ত একটি বা দুটি গ্রামের মধ্যে তাঁর পরিচিতি সীমায়িত। উদাহরণ স্বরূপ কিছু সংখ্যক সিনি দেবী ও রঙ্কিনী দেবীর কথা উল্লেখ করা যায়। অনেকগুলি আস্থান পরিবর্তনের পরও রঙ্কিনী দেবী বিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠাতা আছেন। কিন্তু এঁর ভৈরব রয়ে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে, শিলদায়। ওড়িশার সঙ্গেও রঙ্কিনী দেবী একাধিক দিক থেকে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এই দেবী আর তাঁর ভৈরবকে কেন্দ্র করে বাঙলা, বিহার, ওড়িশার লোকসমাজ ও আদিবাসীসমাজের মানুষের ধর্মসাধনায়, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের রাজ্যে এক অভাবিত সেতুবন্ধন ঘটেছে। তাছাড়া লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলতে দেবী রঙ্কিনীর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রঙ্কিনী, শীতলা বা অনুরূপ কিছু দেব-দেবীর অভিধা বদল ঘটেনি। তাঁরা একই নামে দুই বা তিনটি রাজ্যে পূজিত হন। আবার কিছু দেব-দেবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্নরাজ্যে যাওয়ার ফলে নামান্তর ঘটেছে। কিন্তু তা সত্বেও সেইসব লৌকিক দেবদেবীদের চিনতে খুব অসুবিধা হয় না। তাঁদের প্রকৃতির মিল, পূজা-কৃত্যের মিল এবং সর্বোপরি পরিপার্শ্বের মিলে তাঁদের আপাত গুপ্ত পরিচয় স্বপ্রকাশ হয়ে পড়ে।

বিহারের লোকধর্মের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে প্রথমে নজরে আসে যে, এখানকার লোকসমাজ প্রধান পৌরাণিক ধর্মের দেব-দেবীর প্রভাবে আচ্ছন্ন। তুলনামূলকভাবে বেশ দুর্বল হলেও এই প্রভাবধারা অবশ্যই আছে তবে তার কতটুকু আদিবাসী-সমাজের ধর্মচেতনার ফল আর কতটুকু শুদ্ধ লোকসমাজের—এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া কঠিন।

দেবী মহামায়া

দুর্গাপূজার পর অক্টোবর—নভেম্বর মাসে বিহারের প্রায় সব গ্রামে (এমনকি সাঁওতাল পরগণার গ্রামগুলিতেও) নবরাত্রে এই দেবী মহামায়ার পূজা হয়ে থাকে ফুল, সিঁদুর, রঙিন কাপড় ইত্যাদি এবং পাঁঠা ও পায়রা দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। কখনো কখনো অন্যান্য প্রাণী নিবেদন করে তাদের কান কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। দেবীর কাছে বছর বছর বহু ভক্ত মানত করেন। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলে পরের বছর সাধ্য অনুসারে ভক্তরা দেবীর পূজা-বেদী লাল কাপড়ে মুড়ে দেন, সাতটি মাটির পাত্র শস্যপূর্ণ করে তাতে একটি করে কাঁচের চুড়ি দিয়ে দেন। দেবী মহামায়ার প্রত্যেকটি আস্থানে সাতটি পৃথক দেবীর জন্য সাতটি করে বেদী নির্মিত দেখা যায়। এই সাত দেবী

মুহূর্তে পশ্চিম বঙ্গের লৌকিক দেবী সাতবোন, সাত বউনি, সাতবিবি ও লোকসংস্কারে সংখ্যা হিসাবে সাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সূত্রে পরিশীলিত ধর্মের সপ্তমাতৃকাতত্ত্ব এসে যায়। অবশ্য সপ্তমাতৃকার তালিকা সেখানে তেমন নির্দিষ্ট নয়। ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রানী নিয়ে গোলযোগ বড় কম নেই। সেদিক থেকে তন্ত্রের সপ্তমাতৃকার তালিকা বেশ আকর্ষণীয় যেমন, (১) গর্ভধারিণী জননী (২) ধাত্রী বা স্তন্যদায়িনী জননী (৩) গবী বা গো-মাতা (৪) গ্রাম মাতৃকা (৫) দেশ মাতৃকা (৬) ভাষা মাতৃকা এবং (৭) মাতা জগৎ অম্বিকা।

ঢেলাই মাই

আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর চব্বিশপরগণায় নৈহাটির কাছে এক লৌকিক দেবীর অস্তিত্বের কথা জানিয়েছিলেন যাঁর নৈবেদ্য ছিল মাটির ঢেলা। এই দেবীকে তখন কেউ কেউ বৃক্ষদেবী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় এঁকে চণ্ডীর রকমফের বলে মনে করতেন এবং ভক্তদের কাছ থেকেও জেনেছিলেন ইনি ঢেলাই চণ্ডী। বিহারে অনুরূপ এক দেবীর সন্ধান আমরা পাই যাঁকে 'ঢেলাই মাই' নামে ডাকা হয়। ভাগলপুর শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে বাড়ারিঘাটের কাছাকাছি একটি দেবী-থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় বর্তমান আলোচক দুজন আধুনিক পরিচ্ছদশোভিত যুবককে রাস্তার পাশ থেকে মাটির চাপড়া তুলে দেবীর থানের উদ্দেশ্যে ছুঁড়তে দেখেছেন। এই দৃশ্যে বিস্মিত হয়ে অনুসন্ধান করা হয়। জানা যায়, ইনি অতি পরিচিতা ঢেলাই মাই। জনৈক ভক্তের কথা অনুযায়ী বলা যায়, ঢেলাই মা মাটির ঢেলা পেলে সন্দেশ-রসগোল্লা ফেলে খান। স্বর্গীয় শাস্ত্রীমহাশয় বর্ণিত নৈহাটির ঢেলাই চণ্ডীর থানটি তখন একটি খেজুর গাছের তলায় ছিল, সম্ভবত সেইকারণে অনেকে একে লৌকিক বৃক্ষ দেবী আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্ধকারে খেজুর গাছের চেহারার সঙ্গে কল্পিত অপদেবীর মিল দেখে আবার কেউ কেউ ঢেলাই চণ্ডীকে অপদেবী বলেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, পরবর্তীকালে খেজুর গাছটি মরে যাবার পর ঢেলাই চণ্ডীর থানটি ঐখানেই অন্য এক গাছতলায় থেকে যায়। বৃক্ষদেবীর কোন নির্দিষ্ট গাছ নেই—এ এক বিচিত্র ব্যাপার। আসলে পূজা আমরা বৃক্ষকে করি না—বৃক্ষপ্রতীককে করি। বিহারে ঢেলাই মাইয়ের সঙ্গে বৃক্ষের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে প্রতীক হিসাবে যে যে গাছ লোকসমাজে পূজা পায় তার মধ্যে কাভি (পোতারি), কিকর (বাব্‌লা), বেল, কদম্ব, কাঁঠাল, নিম, মহুয়া, পেথা (চাল-কুমড়ো), টেণ্ডু (গাব), পিলখন (পাকুড়), বোড় (বট), পিপল (অশত্থ), জাহুম (জবা), শিম্বর (শিমূল) ইত্যাদি প্রধান। ঢেলাই মাই এগুলির কোনটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন্। সম্ভবত ধরিত্রীপূজার একটি সহজ সরল লৌকিক রূপ আমরা ঢেলাই মাইয়ের পূজার মধ্যে দেখতে পাই। কৃষিকাজের প্রধান উপকরণ যে ভূমি তারই প্রতীক দেবী হলেন এই ঢেলাই মাই। ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় বীজরোপণের সময়ে কৃষকেরা ঢেলাই মাইকে আথ্‌সট্ট নিবেদন করেছেন।

ঘোড়াই মাই—হাথি মাই

কহলগাঁর কাছে একটি লোকদেবীর থান আছে যা দেখার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার সিনি দেবীর থানগুলির সাজসজ্জা স্মরণে আসে। এই দেবীর থানে ছোটবড় অসংখ্য মাটির ঘোড়া পড়ে আছে। ভক্তরা মাটির ঘোড়া দিয়ে এই দেবীর কাছে মানত করে। মনের বাসনা পূর্ণ হলে আরো অনেক

ঘোড়া দিয়ে এই দেবীর কাছে মানত করে। মনের বাসনা পূর্ণ হলে আরো অনেক ঘোড়া দিয়ে দেবীর থান সাজানো হয় এবং অথ্‌সট্ট ও অন্যান্য দ্রব্য নিবেদন করা হয়। অনুরূপ সাজসজ্জা এবং অনুষ্ঠান ও কৃত্য পালন করা হয় হাথি মাইয়ের থানে।

বনি দেবী

এক সামন্ত রাজা মস্ত দীঘি কাটিয়েছেন। দীঘির পাশে চারধারের জমিতে চমৎকার ফুল-বাগান সাজিয়েছেন। সেই ফুল-বাগান থেকে প্রতিদিন রাণীর নির্দেশে এক পরিচারিকা ফুল তুলে আনে দেবী গৌরীর পূজার জন্য। একদিন রাণীর পরিচারিকা ফুল তুলছে এমন সময় একটি ফুটফুটে মেয়ে সেই ডালা সমেত ফুল চেয়ে বসল। পরিচারিকা অসহায়ভাবে বলল, 'আমার আর দিতে কি ? কিন্তু রাণীমা যে রাগ করবেন। জানো না তো এ ফুল দেবী গৌরীর পূজার জন্য তোলা হচ্ছে।' মেয়েটি পরিচারিকার কথা শুনে শুধু হাসছে।—বিহারের লোকদেবী বনি বা বন্থি মাই সম্পর্কিত এই লোককথা শুনতে শুনতে স্মরণে আসে পশ্চিম বাঙলার হুগলী জেলার দেবী রাজবল্লভীর কথা। অবশ্য পার্থক্য একটু আছে, পশ্চিম বাঙলায় রাজবল্লভীর প্রতিষ্ঠা রাজা ও বণিকের যৌথ আনুকূল্যে। কিন্তু বিহারে বন্থি দেবীর প্রতিষ্ঠা মূলত লোকসমাজের আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধায়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি লক্ষ্য করার আছে। দেবী রাজবল্লভীর পূজায় মহানবমীর দিনে 'প্যাচের বলি' নামে এক বিচিত্র ধরণের বলিপ্রথা লক্ষিত হয়েছে। পাঁঠাটি হাঁড়ি কাঠে না ফেলে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মুণ্ড ধর থেকে বিচ্ছিন্ন করার নাম প্যাচের বলি। বিশেষ মানত উপলক্ষে দেবী বন্থির কাছে প্যাচের বলি উৎসর্গ করা হয়। তবে তা কখনো পাঁঠা নয়, ছাগল। বন্থি দেবী সম্পর্কে প্রাথমিক যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তাতে অনুমিত হয়েছিল যে এই দেবী 'বহ্নি' অর্থাৎ আগুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু বহ্নির সঙ্গে যুক্তা পৃথক্ এক লৌকিক দেবী এখানে আছেন এবং তিনি বন্থি দেবী নন্—ভস্মী দেবী নামে সমধিক পরিচিতা।

গোরেয়া বাবা

বিহারের প্রায় সর্বত্র এই গোরেয়া বাবার মহিমা প্রতিষ্ঠিত। গৃহপালিত জীবজন্তু বিশেষ করে গবাদিপশুর রোগারোগ্য ও কল্যাণের জন্য গোরেয়া বাবার পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। গোরেয়া প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলার নদীয়া রূপদহের কাটারি ফকীর এবং উভয় বাঙলার লোকপূজ্য মাণিক পীর সাহেবের কথা স্মরণে আসে। গোরেয়ার সঙ্গে গবাদিপশুর ব্যাপারে আরেক লোকদেবতার কথা শোনা যায়, তাঁর পরিচিতি গবনাই বাবা হিসাবে। লোকশ্রুতি, গবনাই বাস্তবে এক রাখাল বালক ছিলেন। একবার মাঠে গরু চরাতে চরাতে গবনাই বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হন। প্রাণপণ লড়াই শেষে গবনাই ঐ বাঘের আক্রমণে নিহত হন এবং পরে দেবায়িত মহিমায় উন্নীত হন। গবনাই বাবাকে নিয়ে বেশকিছু লোকগীতি সৃষ্টি হয়েছে। বাঙলায় যেমন মাণিক পীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে খাদেমদের লোকেরা গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ায়, বিহারে তেমনি একটি ছোট মূর্তি নিয়ে কিছু কিছু লোক গবনাই গীতি পরিবেশন করে। গবাদিপশুর বন্ধ্যাত্ব ঘোচানোর জন্য গোরেয়া এবং গবনাইয়ের পূজা দেওয়া হয়। কাটারি ফকীর এবং মাণিক পীরকে কেন্দ্র করে বাঙলায় যেমন মেলা বসে বিহারে তেমনি বসে গোরেয়া ও গবনাই বাবাকে কেন্দ্র করে।

ভুত ব্রহ্ম

বিহারের নিতান্তই আঞ্চলিক লোকদেবতা ভূত ব্রহ্ম প্রায় অধিকাংশ গ্রামে পূজিত হন। সাধারণভাবে মৃত্যু না হয়ে যদি অগ্নিদগ্ধ বা বন্যপ্রাণীর আক্রমণে কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয় তাহলে মৃতব্যক্তি যে গ্রামে জীবিতকালে বসবাস করতেন সেই গ্রামের মানুষ মৃত ব্রাহ্মণকে 'ভূত ব্রহ্ম' জ্ঞানে পূজা দেন। এই পূজায় নৈবেদ্যর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হল পায়েস। তাছাড়া বর্ষায় সিধে নৈবেদ্য ভূত ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং সপ্তভোজ্য দেওয়া হয়।

শামে মাই

বিহারে এই শ্যামা বা কালীর কোন মূর্তি গড়ে পূজা হয় না। অধিকন্তু ইনি কোন উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে পূজাও পান না। এঁর ভক্তদের মধ্যে ডোমর, মেথর এবং দোশাদরা প্রধান। দেবী হিসাবে এঁর তেমন মর্যাদা আছে বলেও মনে হয় না। সাধারণত দেবী মহামায়ার আস্থানের বাইরে অনেকটা দূরে থানিকটা কুণ্ঠার সঙ্গে ইনি বিরাজ করেন। দেওয়ালির সময়েও ইনি কোন বিশেষ মর্যাদা পান না। সাধারণত এঁর কাছে শূয়োর উৎসর্গ করা হয়।

চিরকুরাই মাই

ভূত ব্রহ্ম বা শামে মাইয়ের মতো দেবী চিরকুরাই ও নিতান্ত অঞ্চল বিশেষের দেবী। এঁকে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র আচ্ছাদিত শীত বুড়ী হিসাবে বিহারের লোকসমাজ গ্রহণ করেছেন। এঁর থানের পাশ দিয়ে যিনি যখন যান তিনি কোন না ছেঁড়া কাপড় চিরকুরাই মাইয়ের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন।

চক্রদেবী বঞ্জরী

সাধারণত গাড়ীর রাস্তার পাশে এর থান। এঁর ভক্ত বলতে চাকাওলা গাড়ীর চৌধুরীদের বোঝায়। গাড়ীর চাকায় তেল দিয়ে বঞ্জরী মায়ের জয়ধ্বনি করা হয়। কখনো কখনো গাড়ী নিয়ে পথে বড়োরকমের ঝামেলা হলে বা গাড়ী খাদে পড়ে গেলে চৌধুরীরা বিশ্বাস করেন যে বঞ্জরী মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। তখন অনেক চৌধুরী একত্র হয়ে বঞ্জরী মায়ের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে।

বুড্‌ঢি মাই

গোড্ডার কাছে বাস-রাস্তা থেকে সামান্য দূরে একটি গাছতলায় ইনি বিরাজ করেন। মাটি লেপে বেদী তৈরী করে চিক্-সিঁদুরে লেপা একটি মাটির সাপকে সামনে রেখে তার পেছনে একটি সিঁদুর লেপা নুড়ি—এই হলেন বুড্‌ঢি মাই। বছরভোর তাঁর পূজা হলেও কেউ-ই তেমন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এলে ইনি সর্বজনপূজ্যা হয়ে ওঠেন। গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন বুড্‌ঢির থানে কোন না কোন বিশেষ পূজা লেগে থাকে। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এঁর বার্ষিক পূজোৎসব হয়। বাসুকিনাথের কাছ থেকে একজন মৈথিলী ঝা এসে এঁর পূজা করেন এবং পূজার সময় লৌকিক গন্ধ সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে পৌরাণিক মতে এঁকে মা মনসাজ্ঞানে অর্চনা করা হয়। ব্রাহ্মণ-পূজারী দেবী-থানের নমস্কারী নিয়ে চলে গেলে বুড্‌ঢি মাই আবার লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজের পূজ্যা হয়ে ওঠেন।

অরুণাচলের লোকগীতি

অশোককুমার বসু

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশটির নাম অরুণাচল। ৩১,৪৩৭ বর্গ মাইল, পর্বত ও অরণ্য অধ্যুষিত অরুণাচলকে পাঁচটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে। যথা—কামেং, সুবণসিরি, সিয়াং, লোহিত ও টিরাপ। এই পাঁচটি জেলায় প্রায় ২০টি (ইন্দো—মঙ্গোলয়েড) উপজাতির বাস। এই সব উপজাতিকে,—সমাজনীতি, লোকাচার ও ভাষাগত পার্থক্যের জন্য ৭০টি শাখা প্রশাখায় ভাগ করা যায়।

অরুণাচলের প্রায় ৫লক্ষ উপজাতিদের মধ্যে ৩০টি ভাষা প্রচলিত। কোন ভাষারই লিপি নেই। এদের কোন লিখিত ইতিহাসও পাওয়া যায় না। লোকগাথা ও কয়েকটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে এদের ইতিহাস গড়ে নিতে হয়েছে। এইসব লোকগাথা ছাড়াও, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, প্রেম, বাৎসল্য, আশা আকাঙ্খা ইত্যাদি নিয়ে অনেক গান এদের ভাষায় পাওয়া যায়। গানের উপমাগুলি সহজ ও সরল—পাণ্ডিত্যের ভারে পীড়িত নয়। যদি ও অরুণাচলের প্রচণ্ড দুর্গমতার জন্য, অধিবাসীরা বহির্জগত হতে বহুযুগ ধরে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল, তবুও লোকগীতিগুলি লক্ষ্য করলে সনাতন মানবের চিরন্তন হৃদয়ের আবেগানুভূতি পাওয়া যায়।

এই সব উপজাতিদের কথ্য ও সাধুভাষা বলে আলাদা কিছু নেই। আমাদের চেনা জানা ব্যাকরণ অথবা বাক্য গঠনের প্রণালীর সঙ্গে এদের ভাষার বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষাবিদরা এইসব ভাষাকে তিব্বতী-ব্রহ্মভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অব্যয় যুক্তিকরণ পদ্ধতিতে, এইসব উপজাতির অনেক ভাষাতেই বাক্য রচিত হয়। অব্যয়গুলি ভাষাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে। বাক্যে এদের প্রয়োগ কৌশল বহু অর্থবহ। উদাহরণ স্বরূপ, গ্যালোং ভাষার কয়েকটি কথা দিয়ে, বাক্য রচনার পদ্ধতিটি বোঝানো যেতে পারে।

কাকেন – সুন্দর ; কাকেন দো – সুন্দর (হয়)
কাকেনঙ দো – অতি সুন্দর (হয়)
ইন্ – যাওয়া
ইন্তোকো – তুমি যাও (অনুজ্ঞা প্রকার)
ইনঙ তোকো – তুমি অবশ্যই যাও (আদেশ)
ঙ ইন্ দো – আমি যাই।
ঙ ইন্‌লিদো – আমি যেতে ইচ্ছা করি।
ঙ ইন্‌গলিদো – আমি ঘুরে বেড়াতে চাই।

এই প্রথায় অব্যয় জুড়ে জুড়ে, গ্যালং ও অন্যান্যরা তাদের মনের ভাব অতি সুষ্টুভাবে বোঝাতে পারে। ভাষায় হয়তো বিপুল শব্দসম্ভার নেই, কিন্তু সেজন্য পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান প্রদানে বিন্দুমাত্র

অসুবিধা নেই। ভাষার মান নির্ভর করে, তার শব্দর ধ্বনি মাধুর্য এবং বাক্যের অর্থবহতার ওপর। সে হিসাবে এইসব উপজাতিদের ভাষাগুলি অতি সুন্দর ও সমৃদ্ধ।

সিয়াং জেলার আদি উপজাতির গ্যালোং বা গালো একটি শাখা। একটি গালো রমণী গৃহকর্মরতা। তার কচি ছেলেটির ঘুম পেয়েছে, কাঁদছে। ছেলেটিকে পিঠে দোলায় ঝুলিয়ে, তার বাবা গান গেয়ে ভোলাচ্ছে।

একুয় তাকুয় এত্ তাল্।
এচুমগো তাহুমগো আবুগে রেতুম্॥
ইয়েদি তালিদোনা
ইয়েদি বুদোনা।
আবো ঙ তালিজামা হুম্দাচো হুম্য়েক্দো।
মুপুক্ রেণিয়াক্ নিয়াক্প্ সিলাজু।
মুপুক্ কুমুক্ গিয়োকা হুম্দাসোগো হুম্য়েক্দো।

বাবা বলছে—কি হয়েছে বাছা? এই তো আমি, তোমার বাবা। তোমার মাথা রয়েছে আমার মাথায়। আমি কি তোমাকে বকেছি? আমি তোমায় কতো ভাল বাসি। রাগ কোরোনা সোনা আমার।

প্রথম দুটি লাইনের (ইকড়ি কিকড়ি চাম্ চিকড়ির মতো) কোন অর্থ নেই। আমাদের বাংলায় ছেলে ভুলানো ছড়ায় যেমন আছে—কে মেরেছে, কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল, এই ঘুম পাড়ানো ছড়াটাও যেন সেই ধরণের।

(ইয়েদি তালি দোনা—কে তোমায় বকেছে বা বিরক্ত করেছে? ইয়েদি বুদোনা—কে তোমায় বিরক্ত করছে? আবো ঙ—আমি তোমার বাবা। তালিজামা—আমি তোমায় বিরক্ত করছি না। হুমদাচো হুম্য়েক্দো—দুটি মাথা পরস্পরের কাছাকাছি রয়েছে। মুপুক্ রেণিয়াক্—কোমল চিত্ত। নিয়াক্প্ সিলাজু—আমরা দুজনে পরস্পরকে ভালবাসি। কুমুক্ গিয়াকো—রাগ কোরো না)

লোহিত জেলায় মিশমী উপজাতিদের বাস। তন্তুশিল্প এদের জীবনের অঙ্গ। তাঁত বুনতে না জানলে মেয়েরা বিবাহ যোগ্যা বলে গণ্য হয় না। একটি ইদু মিশমী (মিশমীদের একটি শাখা) কুমারী তাঁত বুনতে বুনতে মনের দুঃখে গান গাইছে।—এখনও তার ভালবাসার মানুষ জোটে নি—

আ—আ—লো গাদা ডোথরু হা—না—
উ—উ আবি লো গাদা ডোথরু হা—না—উ—উ—
নারু—উ—তো—ও—উজি—উ—
সো—ও—জাম্বো উজি উ—উ—

লোক গীতিটি কুমারীর হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করছে। প্রায় প্রতি কথাটি সুর টেনে টেনে সে গাইছে। আজও তার কাছে কেউই এল না বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তাঁত বোনার সময়, বোনার কাঠির (আ আ ও আবি) আওয়াজ দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে জানিয়ে দিক তার হৃদয়ের ব্যথা। সে

যে অবলা মেয়ে। নারু ও সোজাম্বো গাছের মতোই সে নড়তে পারে না। কেউ যদি তার কাছে না এগিয়ে আসে সে কী করবে?

(আ—আ—তাঁত বোনার কাঠি। লো—তুলে ধরা। গাদা—ক্রমাগত। ডোথরু—ঘোষণাকরা, জোরে আওয়াজ করে কিছু জানানো। উ—উ—হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্য কণ্ঠ নিঃসৃত স্বর। আবিলো—সুতো গোটাবার বাঁশের কাঠি। নারু—একপ্রকার স্থানীয় গাছ। হানা—দেওয়া, খবর ছড়িয়ে দেওয়া)

নদী কিম্বা ঝরণার জল কাক চক্ষুর মতো স্বচ্ছ সুশীতল। কার না চান করতে মন চায়? নদী-দীঘি-জল নিয়ে শুধুই যে বাংলায় লোকগীতি আছে তা নয়। টিরাপ জেলার একটি ওয়াঞ্চু যুবক ও এই রকম সুন্দর জলে অবগাহনের সঙ্গে, প্রেমসায়রে ডুব দেওয়ার মিল খুঁজে পেয়েছে। সে গাইছে—

নিশোতুন কানোই লঙ্ জে—এ—লু—উ
নোক্ কাওয়ান্ তো জাজোমা জান্হাম্ কোয়া

ছেলেমেয়েদের মধ্যে, অনুরাগ জন্মাবার ঠিক আগে হাসি খেলে যায় ঠোঁটের কোণে। সুশীতল স্বচ্ছ জল দেখলে, স্নান করে দেহ জুড়াতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। সেইরকম, একটি সুন্দরীর প্রথম দর্শনেই প্রেম সায়রে ডুব দিতে ইচ্ছা করে। যুবক ও যুবতী যে কেউ এই প্রেমের গানটি গেয়ে থাকে বা গাইতে পারে। মানেটি বুঝতে পারলে, মনে হয় যেন বৈষ্ণব পদাবলীর পিরীতি রসের ভাবধারাটি ওয়াঞ্চুভাষার গানে ধরা পড়ছে।

(নিশোতুন—সহাস্যমুখ। লঙ্—পাথর, নুড়ি। জেলু—জলাধার অর্থাৎ নদী, পুকুর, ঝরণা ইত্যাদি। কানোয়—স্বচ্ছ, পরিষ্কার। নোক্—মানুষ। কাওয়ানতো—দেহ। জান্হাম্—স্বচ্ছ)

দুর্গম অঞ্চলে, ওয়াঞ্চুদের নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনে দুষ্কর্ম, কলহ, বিবাদ করার সুযোগ খুবই কম। সামাজিক নিয়ম কানুন খুবই কড়া। তথাকথিত শিক্ষারও অভাব। তবুও সৎ অসৎ ইত্যাদি মৌলিক নীতি বোধ সম্বন্ধে—এরা, শিক্ষিত মানুষের মতই অবহিত। একটি গানে বলা হচ্ছে—

আপং পোংফাই লেজা নাই জেনাই নামসু সোয়
হোয়া তো অজিক থাপ কাক্ সোই সু হানই হামকোয়।

অর্থাৎ—তেল, নামসু ও অন্যান্য পাতা মিশিয়ে যেমন সুন্দর রান্না হয়, সেই রকম একটি সৎলোক তার অমায়িক ও ভদ্র আচরণের জন্য সকলের সঙ্গে মিশতে পারে ও সর্বদা ভাল সম্বন্ধ রাখতে পারে।

(আপং পোং ফাই—যে ব্যক্তি সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। লেজানাই—সকলের সঙ্গে মিষ্ট কথা বলে। সোয়—সব্জী। জেনাই নাম্সু—নামসু পাতা মিশ্রিত তরকারী। হোয়া তো—পাহাড়। অজিক্—একপ্রকার গাছের পাতা। সোয়সু—তরকারী রান্নার জন্য একপ্রকার পাতা। হামকোয়—হাওয়া)

প্রবন্ধের কলেবর স্ফীতির আশঙ্কায় মাত্র কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হল। অরুণাচলের মোটামুটি সব উপজাতির ভাষায় বহু লোকগীতি পাওয়া যায়। অর্থ বোধগম্য হলে মনে হয় যেন চেনা গানের কলি। গানগুলি গেয়ে শোনালে, ধ্বনি মাধুর্যে চমৎকৃত হতে হয়।

লোকগীতির মুখ্য উপজীব্য মাটি ও মানুষ এবং প্রধান চিহ্ন মৌখতা। ভারতের অন্যান্য উপজাতিদের মতোই অরুণাচলের উপজাতিদের বিদ্যুৎ ও রাজপথ বিহীন জীবন—কৃষিভিত্তিক, সরল ও অনাড়ম্বর। উদরান্নের জন্য উদয়াস্ত ও পরিশ্রমের ফাঁকে ও অবসরকালে বহুযুগ আগে রচিত এই সব লোকগীতি, এরা শ্রুতিপরম্পরায় একই সুরে গেয়ে চলেছে। বাংলা ও অন্যান্য ভাষার মতো হয়তো এসব ভাষার অভিভাজনতা (adaptibility) কম, হয়তো বা অত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী নয়, তবুও এইসব লোকগীতির মাধ্যমে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে বৃহত্তর জগতের অধিবাসীদের চিন্তাধারা ও হৃদয়াবেগের সাযুজ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপমার মিল দেখে, মনে প্রশ্ন জাগে যে সংলগ্ন প্রদেশের (আসাম ও বঙ্গদেশ) অধিবাসীদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির দ্বারা এরা কী কোনকালে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। অন্যথা মানব সভ্যতার প্রাক্কালে, যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদ্বিকে তখন সেই একই চিন্তার বীজ সকলের মনেই নিহিত ছিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে, সেই সুপ্ত বীজ কালক্রমে, নানা গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন বৃক্ষে রূপায়িত হয়েছে যদিও তার অন্তর্নিহিত সুরটি এক। যাই হোক, লোক সংস্কৃতির ইতিহাসে, অরুণাচল আজও স্বল্প আলোচিত। অরুণাচলের লোকগীতির ব্যাপক গবেষণায় বহু অমূল্য ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাবে। বাঙ্গালী গবেষক ও রসিকরা যদি তাঁদের অনুসন্ধানের ফল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ইংরাজীতে না লিখে বাংলা ভাষায় লেখেন, সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি তথা বাঙ্গালীরা যে সাতিশয় উপকৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বনমহোৎসবের আদিপর্বে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

বাংলা ১৩৮৩ সালের অগ্রহায়ণের সমকালীনে 'ভোজ রাজার' প্রণীত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'যুক্তি কল্পতরু' গ্রন্থের বক্তব্য নিয়ে নিবন্ধ ছিল। অবশ্য আজও স্থির করা যায় নি 'ভোজরাজ' বলে আমরা কাকে বুঝবো? কারণ, ভোজ এই সংজ্ঞাটি তো কোন ব্যক্তির নয়, ওটা একটা প্রখ্যাত রাজ বংশের নাম। তা থাক্, সেই খ্যাতি বিশেষিত পুরুষ যিনিই হন, তার নামে প্রচলিত ভোজ গ্রন্থাবলির মধ্যে দেখা যায় 'বন বিনোদ'ও একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তখনকার সামাজিক ইতিহাস যাঁরা পড়েন, তাঁরা বোঝেন যে, বাংলায় তখনও পাল বংশের শাসন চলছে, যে বংশের সমাধি হয় আনুমানিক ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের ভাততে তখন ভোজবংশীয়দেরই প্রাধান্য, যে প্রাধান্য আনুমানিক ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এমনি প্রবাহ চলার সময়েই ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থলেখক 'ভোজরাজ' জীবিত ছিলেন।

তিনি 'বনবিনোদ' গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন সেটির সংক্ষিপ্ত রূপ আজকের 'বনমহোৎসবে' পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থের বক্তব্য কিন্তু সংক্ষিপ্ত নয়, বরং বলা যায়, কোন সুদূর অতীতের ভারতীয় সংস্কৃতিতে অথর্ব বেদের অন্তর্গত 'বনায়ুর্বেদেরই' সংগ্রথিত অবদান। অর্থাৎ বনায়ুর্বেদের বিশাল বক্তব্যগুলিকে বেশ একটি সংহিতা গ্রন্থের আকারেই রূপ দিয়েছেন।

গ্রন্থের বক্তব্য জানাতে প্রথমেই বলেছেন, ধর্ম ও অর্থহীন কতকগুলি সন্তানের জনক হওয়ার চেয়ে পথের ধারে ঘন পত্র ধরা একটি গাছ লাগানই ভাল, কারণ এর তলায় বসে পথের পথিক কিছুক্ষণের জন্যও বিশ্রামসুখ লাভ করে, তখন মহোৎসবের সুখ লাভ হয়—

'বহুভির্বত কিংজাতৈঃ পুত্রৈর্ধর্মার্থ বর্জিতৈঃ।
মহোৎসর্ব সুখং যত্র লভ্যতে পথি বৃক্ষতঃ॥

এর পরই গ্রন্থকার বলেছেন, পথের ধারে একটি বড় দীঘি খনন করলে দশটি কূপ খনন করে দেওয়ার চেয়ে ঢের উপকার করা হয় সমাজের, আবার একটি হ্রদ দশটি দীঘির চেয়েও কল্যাণকর, সুযোগ্য পুত্র দশটি হ্রদের তুল্য, কিন্তু একটি ছায়াতরু রোপণের অর্থ দশটি যোগ্য পুত্রের তুল্য 'দশ হ্রদ সমঃ পুত্রো দশপুত্রঃ পথি দ্রুমঃ'

ভোজরাজ এর পরেই নির্বাচন করে দিয়েছেন কোন কোন বৃক্ষ পথের ধারে বসাতে হবে। এক এক বৃক্ষের রোপণের পুণ্যফল অপর অপর বৃক্ষের পুণ্যফলের ক্রমোর্ধে হয়ে সঞ্চিত হয়—অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণের ফল মৃত্যুর পর আর তার পুনরাবৃত্তি হয় না। এমনিভাবে আমলকী, বট, নিম্ব পাকুড় আম, শিরীষ, পলাশ, উদুম্বর (ডুমুর) মহুয়া, পিয়াল, জাম, তেঁতুল, কয়েৎ বেলও লাগালে সে ব্যক্তির পুণ্য ফলের ইয়ত্তা করা যায় না।

ভোজরাজ বুঝেছিলেন আমাদের সমাজে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক কাজে লাগাতে হলে, তার কাজে যদি পুণ্যবত্তার কর্মফল ঘোষণা না করা যায় তবে এদেশে কোন ব্যক্তিই সমাজ সেবক হয় না।

এই বিংশ শতাব্দীতে বনমহোৎসবের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তার সদ্ব্যবহার হয় কতটুকু? কারণ ঐ সব উৎসবে যাঁরা আগমন করেন, তাঁরা কি আর ফিরে চান ঐ লাগান গাছগুলির পরবর্তী অবস্থা কি ঘটে?

ভোজরাজ বুঝেছিলেন এ ভারতের সব চেয়ে বড় সংস্কৃতি হলো প্রতিটি কাজে ধর্মের ছোঁয়া আছে এটা বোঝাতে পারলেই সে কাজে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। পুরাণ এবং স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, পাকুড় প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাচিত বৃক্ষকে পবিত্র ধর্মবাহী বলে উল্লেখিত করায়, সেগুলি আজও আমাদের সমাজে দীর্ঘজীবী হয়ে আছে।

ভোজরাজ সেই হিসাবেই পথের ছায়াতরুগুলির রোপণের ব্যাপারে পুণ্যার্জনের প্রসঙ্গ এনে তাদের সবাইকে দীর্ঘজীবী করার পথ দেখিয়েছেন। এইজন্য বনমহোৎসবের আয়োজনটি সফল করার উদ্দেশ্যেই লিখেছেন—

অশ্বত্থমেকং শিচুমর্দ মেকং
ন্যগ্রোধমেকং দশ তিন্তিড়ীকম্।
কপিত্থ বিল্বামলক ত্রয়ঞ্চ
পঞ্চাম্র বাপী নরকং ন পশ্যেৎ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশ্বত্থ, নিম্ব ও বটবৃক্ষের এক একটি করে এবং তেঁতুল দশটি, কয়েৎবেল, বেল, আমলকীর তিনটি করে এবং আমগাছ পাঁচটি করে লাগবে তাকে ইহজন্মে, পরজন্মে নরক দর্শন করতে হবে না।

তারপরে, গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে আরম্ভ করেছেন, গৃহীরাও যাতে বৃক্ষ রোপণ করে গৃহেরই শুভ ফল লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা। তাছাড়া কোন বৃক্ষ লাগালে সাপ, এবং বিষাক্ত কীট, বিরক্তিকর শব্দকারী পাখীর আবাস হয়ে ওঠে এবং বাড়ীতে বাস করেও তখন অশান্তি আসে, বা অশুভ হয় তারও ব্যবস্থা করেছেন। এই অধ্যায়টি খুব বিজ্ঞান সম্মত, তবে নিখুঁত কিন্তু বেশ বড় অধ্যায়। কয়েকটা উদাহরণ তুলছি—

গৃহস্য পূর্বদিগ্‌ভাগে ন্যগ্রোধঃ সর্ব কামদঃ।
ঔদুম্বর স্তথা যাম্যে বারুণ্যাং পিপ্‌পলঃ শুভ
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যঃ বিপরীতং তু বর্জয়েৎ॥

অর্থাৎ বাড়ির পূর্বদিকে বট, লাগান ভাল, গৃহীর কল্যাণ হয়। অন্য দিকে বিপরীত ফল। এটা যে বিজ্ঞানসম্মত তা সূর্যরশ্মির বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন। আর দক্ষিণে ডুমুর, পশ্চিমে অশ্বত্থ এবং উত্তরে লাগাতে হবে পাকুড় গাছ।

এমনি ভাবে না লাগলে কি হতে পারে এ প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু ভোজ তার উত্তর লিখেছেন যে ভাবে সেটাও খুব সুন্দর যুক্তি সম্মত বলেছেন।

প্রাণিনঃ সর্ব এবৈব জীবন্তি বায়ুমাশ্রিতা।
বায়বঃ বৃক্ষমাশ্রিত বহন্তি সুখ দুঃখদাঃ।

অর্থাৎ সব প্রাণীই বায়ুকে আশ্রয় করেই জীবন ধারণ করে, আর সেই বায়ুও বৃক্ষাদিকে আশ্রয় করে

সুখপ্রদ দুঃখপ্রদ হয়ে প্রবাহিত হয়। আবার এক এক বৃক্ষ এক এক প্রাণীর সুখপ্রদ ও দুঃখ প্রদত্ত হয় বলেই, তারাও অনুকূল হয়ে ভূমিতে অবস্থান করে। এর সঙ্গে বৃক্ষের ছায়া সম্পর্কেও বিশেষ তথ্য আছে, প্রতিটি বৃক্ষের ছায়াই সকলের অনুকূল হয় না, তাই বট বৃক্ষের ছায়া পূর্বেই ভাল অন্যদিকে নয়।

এরপর ঐ প্রসঙ্গেই ভোজরাজ লিখেছেন কুল, কদলী, দাড়িম, ছোলঙ্গলেবু (গোড়ালেবু) পলাশ, কাঞ্চন, অর্জুন এবং আরও (এদের তালিকায় অন্ততঃ আরও ২০টি) নির্বাচিত কয়েকটি বৃক্ষের রোপণ বাড়ির (বাস্তুতে) কোন অংশেই লাগাতে নাই, তাতে অশুভ হয়। এ সম্বন্ধে বৃক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করলে জানতে ও জানাতে পারবেন কেন নিষেধ করেছেন।

এরপর নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন

বৃক্ষ গুল্ম-লতাদীনাং আশ্রয় স্থান মিচ্ছতাম্।
প্রীণনং পোষণং যাতিঃ বিজ্ঞেয়া ভূমি ভেদতঃ।

অর্থাৎ বৃক্ষ গুল্মলতা এরা তো কথা কয়ে বলে দেয় না,যে এই মাটি এই জল এই বায়ু আমাদের পোষণ, তৃপ্তি বংশ বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল তাই ওদের রোপণ কর্তাকে জেনে নিতে হবে, কি ধরণের জল বায়ু ও মাটি কোন বৃক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল। তাই সমগ্র ভূমি পরীক্ষার প্রয়োজন।

আজ কৃষি শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ নিশ্চয় অনুধাবন করবেন দশম শতাব্দীর ভারতে এনিয়ে গবেষণা অবশ্যই হয়েছিল এবং তারই প্রতিবেদনের লিপিমালা পাই ভোজ লিখিত বন বিনোদ গ্রন্থ। তবে বর্তমানে আরও উন্নত ধরণের পদ্ধতিতে কৃষিবিজ্ঞানি আমাদের যে ভাবে আয়ত্বে আসছে, সে সম্বন্ধে অতীতের ভারতবাসী যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন সেটাও স্বল্প নয়, হয়তো সে পদ্ধতিটিতে আধুনিকদের কাছে নূতন করে গবেষণারও তথ্য থাকতে পারে।

ভূমি নিরূপণের প্রথম পদক্ষেপ—বন বিনোদে বলা হয়েছে—

জাঙ্গলানূপ সামান্য স্বভাবপিচ মেদিনী
ভেদৈঃ সা ভিদ্যতে ষড়ভি বর্ণতো রসত স্তথা॥

অর্থাৎ মৃত্তিকার তিনটি ভেদ। এই ভেদের দ্বারাই দেশের পরিচয়। আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণ। তবে বর্ণভেদেও রসের ভেদে মৃত্তিকার প্রকার ভেদ বহু। তথাপি এ সব ভেদ থাকলেও এ তিন প্রকার দেশেই তাদের ভেদ রয়েছে। বর্ণভেদ বললে এই বোঝা যায় যে, মাটির রং কাল, ফ্যাকাশে নীল, লাল, হলদে এবং সাদা আভাই থাকবে। কাল আভার মাটিতে মিষ্টি রসের প্রাধান্য, পাণ্ডু বর্ণের (ফ্যাকাশে) মাটিতে অম্ল রসই প্রধান, নীল আভায় লবণ প্রধান, লাল মাটিতে তিক্ত রসই প্রধান, হলদে মাটি—কটু রস এবং সাদামাটি হবে কষায় রস প্রধান—

'অসিত বিপাণ্ডু-শ্যামল লোহিত-পীত-শ্বেত-রোচিষঃ ক্রমাৎ।
মধুরাম্ললবণ তিক্তক কটুক কষায়া ভুবো রসতঃ॥

তথাপি একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, বিষাক্ত কীট যে মাটিতে থাকে, অথবা পাথরে ভরা, অথবা উইঢিপী, কিংবা প্রচুর বালি, কিংবা কাঁকর বেশী অথবা লাঙ্গল চালিয়েও দেখা যাবে হঠাৎ হঠাৎ গর্তে ভরে যাচ্ছে, কিংবা অনেক খুঁড়লে তবে জল বের হয়—সে মাটি কোন বৃক্ষেরই উপযোগী নয়।

বিষ-পাষাণ-বল্মীক বিল দুষ্টা তথোষরাঃ।
পুরোদকা শার্কবিলা তরুভ্যো ন হিতামহী।

এরপর বলেছেন এর বিপরীত হলেই বৃক্ষের পক্ষে হিতকর মৃত্তিকা। বিশেষ জ্ঞাতব্য—

শ্যামা সমাসন্ন জলা হরিতা তরুণাঙ্কুরা।
তস্মাৎ সর্বে যথাস্থানং প্ররোহন্তি মহীরুহা।

অর্থাৎ যে মাটির রং কাল, যার অল্প নীচেই জল, এবং বীজের বা কাণ্ড বীজের অঙ্কুর থেকে ওঠা শিশু চারাটির পাতা অল্পেই হরিৎ বর্ণের হয়, সে ভূমি প্রায় সব বৃক্ষেরই উপযোগী। তাছাড়া যে ভূমি, না জাঙ্গল, না আনুপ তাকেই বলা হয়—সাধারণ ভূমি, এবং সেই ভূমিই প্রায় সর্বপ্রকার বৃক্ষের উপযুক্ত—

ন জাঙ্গলা ন চানূপা ভূমিঃ সাধারণী শুভা।
তস্মাৎ সর্বেঽপি তরবঃ প্রায়শঃ লব্ধ জন্মকাঃ॥

এরপর বিশদ তালিকা প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন কোন বৃক্ষ আনুপ (জলাসন্ন ভূমির নাম আনূপ) ভূমিতে ভাল হয়—কাঁঠাল, ভেলো মাদার (লকুচ) বাঁশ (তৃণবৃক্ষ) জম্বীর (জামির লেবু) জাম, তিল, কদম, আমড়া, খেজুর (এরকয়েকটা প্রকার ভেদ আছে) সুপারি, কলা, কেতকী, নারিকেল।

আর জাঙ্গলদেশে ভাল হয় এই গাছগুলি সজিনা, বেল, সপ্তপর্ণী (ছাতিম) শেফালিকা (শিউলি) শমী, অশোক, ছোট-কুল, (সংস্কৃতে কর্কন্ধু, কিন্তু বদর নয়, বদরীও নয়) লেবু, আশ শ্যাওড়া।

তারপর সাধারণ মাটিতে যেগুলির বাড়বাড়ন্ত হয় সেগুলি হলো ছোলঙ্গ লেবু, নাগ কেশর, চম্পক (চাঁপা) আম, প্রিয়ঙ্গু, দাড়িম।

এরপর গ্রন্থকার বলেছেন—এই সব বৃক্ষলতার সংজ্ঞানাস পৃথক পৃথক। অর্থাৎ এক কথায় ওদের নাম পাদপ হলেও কিন্তু প্রতিটি পাদপই এক গোষ্ঠির নয়। কেউ দ্রুম, কেউ লতা আর কেউবা গুল্মশ্রেণীর। আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন, আগে ফুল তার পরে ফল, সেই ফলের বীজে যাদের জন্ম তারা দ্রুম। তবে সেই দ্রুমেরই আর একটি প্রকার ভেদ আছে সেটা হলো ফুল না হয়েও ফল হলে, সেটাকে এক কথায় দ্রুম বলা যাবে কিন্তু আগে ফুল পরে ফল এমন দ্রুমের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে একটি নাম বনস্পতি অপরটির নাম বানস্পত্য।

যারা মাটিতে পড়ে লুটিয়ে বাড়ে তারা লতা, আর যারা মাটি থেকে মাথা তুলেও বেশী বাড়ে না, কিন্তু শাখা প্রশাখায় ভরে যায় তাদের গুল্ম। এই চার প্রকার পাদপগুলির নামও ওতে নিবদ্ধ করেছেন, সবই আমাদের জানা নাম।

দশম শতাব্দীতে কৃষি বিদ্যাকে হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্য বীজ, কাণ্ড ও কাণ্ডকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় এবং কি অবস্থায় রাখলে তাদের কাছে অঙ্কুরের আশা করা যায় এবং জমি প্রস্তুত করারই বা কি রীতি, প্রতিটি কাজের জন্য ভোজ এক একটি শ্লোকের মাধ্যমে তারও একটা ছক করে দিয়েছেন।

যদি জলদি ফসল আশা করা যায়, তবে এই রীতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে, তাছাড়া জলদি ফসলও যেমন কাম্য তেমনি বীজ থেকে অঙ্কুরও যাতে তাড়াতাড়ি বের হয় সেটাও কাম্য

হলে—তার রীতি এই রকম—

অথর্ত্তু পক্কং ফলতো বিশুষ্কতঃ
বিকৃষ্য বীজং পয়সা নিষিচ্য।
বিশোষিতং পঞ্চদিনানি সর্পিষা
বিড়ঙ্গ মিশ্রেণ চ ধূপয়েৎ ততঃ॥

অর্থাৎ ভাল পাকা বীজগুলি সংগ্রহ করে কোন পাত্রে রেখে পাঁচদিন ধরে অল্প অল্প মাত্রায় দুধ ও ঘির সিঞ্চন দেবে, আর কতকগুলি বিড়ঙ্গে আগুন ধরিয়ে তার ধুয়োটা ঐ বীজে লাগাবে। এটা পাঁচদিন।

দ্বিতীয় প্রকার—ঐ বীজগুলি দুধে ডুবিয়ে ছেঁকে তুলে নিয়ে কিছু তিল আর কিছু ঘি একসঙ্গে বেঁটে ঐ বীজে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেবে। শুকিয়ে গেলে সেই বীজ ছড়ালে অঙ্কুর উঠবে দ্রুত, ফসলও হবে তাড়াতাড়ি।

তৃতীয় প্রকার—শুকনো বীজগুলিতে গোবর মাখিয়ে শুকিয়ে নেবার সময় যে কোন প্রকার চর্বির ধোঁয়া (চর্বি পোড়ানোর ধোঁয়া) তাতে লাগালেও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তা থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হবে। সেই বীজ লাগালে ভাল ফলও হবে।

এমনি ভাবে আরও দশ প্রকার বীজ শোধনের পদ্ধতির উন্মেষ দেখা যায়। আজকের দিনেও বীজ শোধন করে রোপণ করার পদ্ধতি অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। তবে কেমিকেল রসায়নগুলি প্রাচীনকালের নয়।

এরপর গ্রন্থে দেখান হয়েছে কোন পাদপ লাগাতে হলে তার আল বাঁধা কেমন হবে জল সেচন করে করতে হবে, কতটা জমি ছেড়ে ছেড়ে লাগাতে হবে, কোন পাদপকে কোন ঋতুর, কোন মাপে লাগাতে হবে, কখন সে ফসল তুলতে হবে ইত্যাদি।—তবে প্রশস্ত কালের আরম্ভ হলো আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। আর একটি মত হলো—গ্রীষ্ম ছাড়া সব মাসেই লাগান চলে, যদি বীজ শোধন করা থাকে—

আষাঢ়ে শ্রাবণে মাসি বীজা বাপন-রোপণে।
গ্রীষ্মাদন্যত্র বল্লীনাং কেচিদিচ্ছন্তি রোপণম্।

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা বলেছে, কোন পাদপ লাগানর পর কি ধরণের আগাছা তুলে ফেলতে হয় তাও জেনে নিতে হবে। তবে একটা কথা—পাদপের একান্ত নিকটবর্তী কোন আগাছাই রাখতে নাই।

সমীপজাতং যত্নেন তৃণগুল্ম লতাদিকম্।
স্ফোটনায়ং বিধিজ্ঞেন পাদপানাং স্বরক্ষণে॥

এরপর শুরু করেছেন বৃক্ষ, লতা, গুল্মগুলি যে লাগান হলো—তাদের রক্ষণ-অবেক্ষণ না করলে তারা তো অচিরেই নির্মূল হয়ে যাবে। এটাতো আজ দেখাই যাচ্ছে, বহু আড়ম্বর বহু অর্থ ব্যয় করে হোমরা চোমরা অতিথি আনিয়ে বনমহোৎসবের অধিবাস করে দিকে দিকে গাছ লাগানোর বাচন ভাষণ প্রচার করা হয় সত্য কিন্তু যেগুলি হয়তো বা পোঁতা হয়, তারপর তাদের কি গতি হোলো সে খবরদারী আর থাকে না।

ভোজরাজ দেখিয়েছেন অনেক কারণে ওরা বিনষ্ট হয়—প্রথম এবং ভীষণ কারণ হলো বৃক্ষলতাদির যেন অজীর্ণ রোগ না হয়, অর্থাৎ মাটিতে জল থাকতে থাকতে আর জল ঢালতে নাই,—সূর্যপক্ক জল শেষ হলেই, তারপর আবার জল সেচন করতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলেই গাছ-গাছালির অজীর্ণ রোগ হয়—

মূলাসন্ন স্থিতং তোয়ং শোষং ন ভজতে যদা।
অজীর্ণং তদ্বিজানীৎ ন দেয়ং তাদৃশং জলম্ ॥

এইসব গাছ-গাছালির শত্রু কারা ?—কুয়াসা, জল মেশান ঝোড়ো হাওয়া, ধোঁয়া, আগুনের আঁচ, মাকড়সা, মশা, ফড়িং এবং কয়েকধরণের কীটই এদের প্রথম শত্রু। এরা পাতা ফুল ফলের বাইরে ভিতরে ক্ষতি করে।

নীহারাৎ চণ্ডবাতাচ্চ ধূমাদ্ বৈশ্বানরাদপি।
জাল কারাৎ তথা কীটাৎ পতঙ্গাৎ মশকাদপি।
পংক্তি মধ্যে, পত্রমধ্যে তথাবাহ্যে পুষ্পবাহ্যে ততোপরে।
ভৈষজ্য যোগাৎ তথা খেদাৎ রক্ষনায়া প্রযত্নত।

প্রয়োজন হলে ভেষজের সেচনেও এদিকে রক্ষা করতে হবে।

পরিষ্কার বোঝা যায় কৃষি বিদ্যা এবং বনমোহৎসবের সুখ কি ভাবে লাভ করা যায় তা দশম শতাব্দীতে ছিলই, তারও বহু আগেই এই ভারতে তার গোড়া পত্তন হয়েছিল।

এরপর আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেটি হলো গাছ-গাছালি কে রক্ষা করতে যেমন তাদের শত্রুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা করতে হবে, তেমনি তাদিকে সতেজ করে রাখতে জলেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জলের ব্যবস্থাটা প্রথমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যদি জানা যায় তবে তো সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ নদী, পুকুর, দীঘি, কুয়ো থেকে জল তুলে আনা তো যাবেই, কিন্তু রাজ্যের বহু বিস্তৃত সীমানায় সেটা তো স্বল্প আয়াসের ব্যাপার নয়, কিন্তু তেমন ভাবে জল সেচন করা ছাড়া যদি প্রকৃতির কোন নিশানা (সিগন্যাল) দেখে ভূমির অভ্যন্তরে জল আছে কত দূরে জানা যায়, তবে সেটা জানলেই তো আরও ভাল হয়।

প্রকৃতির জল নিশানার বিজ্ঞান দেখে জলের সন্ধান লাভে অনেকটা দক্ষতা লাভ করেছিলেন 'পাণি-মহারাজ'। তিনি আজ লোকান্তরিত। কিন্তু তিনি যে পদ্ধতিতে ভারতীয় ভূমির অন্তরে জলের অস্তিত্ব জানতে পারতেন, আজকের প্রকৃতি বিজ্ঞান কিন্তু প্রায় বহুক্ষেত্রেই সাফল্য লাভের যে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, সেটা খুবই প্রশস্ততর। তথাপি বলা যায় সুপ্রাচীনকালে ভারতীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের সমীক্ষাও কোন দৈবলব্ধ জ্ঞান নয়, বারবার সমীহ সমীক্ষাই বলতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত রেখে নিবন্ধ শেষ করছি, বারান্তরে তাঁদের অভিজ্ঞতার লিপিমালার উদ্ধার করা যাবে—

শুকনো জায়গায় বেতগাছ থাকলে তার পশ্চিমে তিন হাত দূরের মাটিতে ছ'হাত আঠার আঙ্গুল নিচে পশ্চিম বাহিনী জলের শিরা পাওয়া যাবে—

যদি বেতসোঽম্বুরহিতে দেশে হস্তৈস্ত্রিভিঃ পশ্চাৎ।
সার্দ্ধে পুরুষে তোয়ং বহতি শিরা পশ্চিমা তত্র ॥

সৌর রসায়ন

হেমন্তকুমার সরকার

বোতলের গায়ে লেখা ছিল—'Drink me up' (আমায় পান কর)—এলিস বিশেষ কিছু না ভেবেই সেই বোতল থেকে তরল পদার্থটা গলায় ঢেলে দিল ; আর তারপর থেকেই ঘটতে লাগলো নানারকমের অদ্ভুত সব ঘটনা। আমাদের এই 'সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা' পৃথিবী তার চোখ মেলেই দেখতে পেল এক আলোকময় জগৎ তার অন্ধকারময় চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে—'এস, আমার অমৃতধারায় সিক্ত হও,' বিস্মিত, হতচকিত, পৃথিবী আঁজলা ভরে পান করল সূর্যের আলো। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীর জীবনেও ঘটতে লাগলো নানা বিস্ময়কর ঘটনা-প্রবাহ। আসুন রসায়নের সিঁড়ি বেয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনা-প্রবাহের জগতটাকে ঘুরে আসা যাক।

এ কাহিনীর গোড়াপত্তন কয়েক কোটি বছর আগে,—ঠিক যখন সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলিকণা জমাট বাঁধতে বাঁধতে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের রূপ নিচ্ছে ; আমাদের সেই আদিম পৃথিবীতে তখন প্রাণের কোন চিহ্নই নেই। তার বায়ুমণ্ডলে তখন অক্সিজেন বলতে কিছুই নেই। আর অক্সিজেন ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব—সে তো কল্পনাই করা যায় না। আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছিল তখন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস। অক্সিজেন তৈরী হওয়া শুরু হয় বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে। জলীয় বাষ্পের উপর সূর্য কিরণের অতিবেগুণী আলোকাংশের বিক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প ভেঙ্গে অক্সিজেন তৈরী হওয়া শুরু হয়। এ বিক্রিয়া কিন্তু বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বেশীদূর প্রবেশ করতে পারে নি কার্বনডাই অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে থাকায়।

জৈব রাসায়নিক ও জীববিজ্ঞানীদের ধারণা এই কার্বনডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাস থেকেই শুরু হয় প্রাণের গোড়াপত্তন। প্রথম প্রথম তৈরী হয় ফরম্যালডিহাইড, ফরমিক এসিড, হাইড্রোজেন সায়নাইড, অ্যাসেটিক এসিড ইত্যাদি অল্প জটিল অণু। তারপর এদেরই মিশ্রিত বিক্রিয়ায় তৈরী হয় সাক্সিনিক এসিড, গ্লাইসিন, অ্যালানিন, এস্পারটিক এসিড, অ্যাডেনিন ইত্যাদি জটিল অণু।

যদিও এই ঘটনাগুলো সেই 'প্রাক-জীবন' যুগেই ঘটেছিল, আমরা কিন্তু এগুলো সম্বন্ধে জেনেছি মাত্র বছর পঁচিশ-তিরিশ আগে। বেশ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, (এস. মিলার, এম. ক্যালাভিন, ওপারিন ইত্যাদি) তাঁদের পরীক্ষাগারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই তথ্যগুলো সম্বন্ধে সুদৃঢ় আলোকপাত করেছেন। বৈজ্ঞানিক মিলার তাঁর পরীক্ষাগারে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণের মধ্যে দুই তড়িৎদ্বারের সাহায্যে প্রবাহিত করলেন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ—কেবল মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য নয়, ক্রমান্বয়ে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে। বিক্রিয়ালব্ধ মিশ্রণের মধ্যে পাওয়া গেল হাইড্রোজেন সায়নাইড, অ্যালানিন (Alanine) এসপারটিক এসিড (Aspartic Acid), গ্লাইসিন, ফরমিক এসিড, অ্যাসেটিক এসিড ইত্যাদি। একটা বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা লক্ষ্য করলেন মিলার—প্রক্রিয়াটি

যতই অগ্রসর হতে থাকলো, ততই গ্যাস মিশ্রণে অ্যামোনিয়ার মাত্রা কমতে লাগলো আর হাইড্রোজেন সায়নাইডের মাত্রা বাড়তে লাগলো। আবার সেই অ্যালনিন, গ্লাইসিন ইত্যাদি অ্যামিনো এসিড তৈরী হওয়া শুরু হল, অমনি হাইড্রোজেন সায়নাইডের মাত্রা কমতে কমতে শূন্যের দিকে এগোল। বৈজ্ঞানিক ক্যালভিনের কাজটা ছিল একটু আলাদা। তিনি অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণে 'ইলেক্‌ট্রন স্রোত' দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর ধারণায় এই রকমই এক ইলেক্‌ট্রন স্রোত সূর্যের থেকে এসে আঘাত করা শুরু করেছিল আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ও পৃথিবী পৃষ্ঠে। এই পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরণের আরও অনেক জটিল অণুর সন্ধান পাওয়া গেল। এই সমস্ত রাসায়নিক পরীক্ষা মোটামুটি ভাবে প্রমাণ করল যে 'প্রাক-জীবন' যুগের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছিল মিথেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাসে ভরা, অক্সিজেন ছিল না বললেই চলে, কারণ অক্সিজেন থাকলে অ্যামিনো এসিড জারিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই সমস্ত বিক্রিয়া প্রকৃতির পরীক্ষাগারে শুরু করে 'রসায়নবিদ সূর্য'।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মিলারের পরীক্ষায় তৈরী হয়েছে হাইড্রোজেন সায়নাইড এবং অবশেষে এই হাইড্রোজেন সায়নাইডই রূপান্তরিত হয়েছে অ্যামিনো এসিডে। এই অ্যামিনো এসিড প্রোটিন তৈরীর কাঠামো, আর প্রোটিন প্রাণ-সৃষ্টির ইট। আজ যে কোন শিক্ষিত মানুষ হাইড্রোজেন সায়নাইডের নামে আঁৎকে ওঠেন—কারণ আমাদের শরীরের মধ্যে হাইড্রোজেন সায়নাইড উপযুক্ত মাত্রায় গেলেই মৃত্যু নেমে আসে। অথচ রসায়নবিদ সূর্য তাঁর পরীক্ষাগারে তাঁর নিজস্ব আলো ও অন্যান্য কয়েকটা গ্যাসের উপস্থিতিতে এই অতিবিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়নাইডকেই জীবজগতের অতিপ্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলেন সেইপ্রাক-জীবন যুগের পৃথিবীতে।—এটা বিস্ময়কর নয় কি ?

অবশ্য কত সহজে এই কথাগুলো লিখে ফেলা গেল, সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়। এই অ্যামিনো এসিড এক সপ্তাহে তৈরী হয় নি, আর প্রাণ সৃষ্টি হয় নি কয়েক মাসে বা বছরে। প্রাণ সৃষ্টি হতে অন্ততঃ কয়েক হাজার বছর লেগেছিল। প্রাক-জীবন পৃথিবীর পরিবেশে প্রকৃতি তার পরীক্ষাগারে এক অমূল্য সৃষ্টিকে তৈরী করেছিল অল্প অল্প করে—অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে।

প্রাণ সৃষ্টির মূলে যে সূর্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য সেই সূর্যের অভ্যন্তর থেকে ঘুরে এলে কেমন হয় ? পাঠক, এখনই কিন্তু আমার সুরে সুর মেলাবেন না। কলকাতার গরমে চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাতেই আপনার গলা শুকিয়ে, ঘেমে নেয়ে প্রাণ আই-ঢাই করে যাই যাই করতে থাকে, আর আমাদের সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতাই হল প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। যতই ভেতরে যাবেন, ততই উষ্ণতা বাড়তে থাকবে—বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত একেবারে কেন্দ্রে প্রায় কুড়ি লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা! সুতরাং কাজ নেই গিয়ে। তারচেয়ে বরং এখানে বসেই সূর্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা যাক।

আসল কথা হল যে পৃথিবীতে বসেই মানুষ সূর্যের আহ্বান, উপাসনা ও বিশ্লেষণ করেছে। সূর্য ওঠা থেকে আরম্ভ করে সূর্য ডোবা পর্যন্ত মানুষ অত্যন্ত কুশলতা ও ধৈর্যের সঙ্গে সূর্যকে লক্ষ্য করেছে এবং তার সাহায্যে নানারকমের রহস্যের সমাধান করেছে। সূর্যের গতিবিধি ও পরিবর্তনের মধ্যে

মানুষকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণকালীন অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা মানুষকে দিয়েছে অনেক নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান। ১৮৬৮ সালে এমনি এক সূর্যগ্রহণের পর ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমীতে পরপর দুটো চিঠি এল—এর মধ্যে একটা ছিল ভারতের উপকূলবর্তী স্থান থেকে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Janssen-এর, আর অন্যটা ছিল ইংল্যাণ্ড থেকে একজন ইংরেজ লকইয়ারের (Lockyer)। দুটো চিঠিরই মূল বক্তব্য ছিল মোটামুটি এক—তাঁরা দুজনেই সূর্যালোকের বর্ণালীর বিশ্লেষণ করে এক নতুন মৌলের সন্ধান পেয়েছেন। তার নাম 'হিলিয়াম'। এই তথ্য সৌরশক্তি ও সৌর রসায়নের বৈজ্ঞানিকদের নতুনভাবে আকৃষ্ট করল। তাঁরা নিজস্ব বর্ণালী-বিশ্লেষক নিয়ে নতুন উদ্যমে সূর্য-বিশ্লেষণে উঠে পড়ে লাগলেন।

স্বভাবতঃই যে দুটো প্রশ্ন প্রথমেই মনের মধ্যে জাগে তা হল এই যে—সূর্য এত শক্তি পেল কোথা থেকে ? এবং সূর্যে হিলিয়াম এল কি করে ? এ দুটো প্রশ্নের উত্তর পারমাণবিক রসায়ন দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য হল আমাদের এই মহাবিশ্ব হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের জগৎ। কেবলমাত্র আমাদের সূর্য নয়,—মহাবিশ্বের সমস্ত তারামণ্ডলীর প্রত্যেকটিতেই হাইড্রোজেন-১ হিলিয়াম-৪-এ রূপান্তরিত হয়ে শক্তি ও আলো জোগাচ্ছে। যদিও এযাবৎ সূর্যে মোট ৬০-টিরও বেশী মৌল খুঁজে পাওয়া গেছে, তবুও সূর্যের প্রচণ্ড শক্তির উৎসরূপে এই হাইড্রোজেন-হিলিয়াম রূপান্তর বিক্রিয়ার উপরেই বৈজ্ঞানিকেরা জোর দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগে—চারটে হাইড্রোজেনের পরমাণুকে একত্রিত করে হিলিয়ামে পরিণত করা কি খুব সহজ ? সত্যি কথা বলতে কি এই একীভবন বা ফিউশন (Fusion) বিক্রিয়া বেশ শক্ত। বিক্রিয়াটি সাধারণতঃ কয়েকটি ধাপে হয়ে থাকে। প্রথমতঃ হাইড্রোজেনের দুটো পরমাণু যুক্ত হয়ে একটা ভারী হাইড্রোজেনের পরমাণু তৈরী করে তার সঙ্গে আরেকটা হাইড্রোজেনের পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরী হয় হিলিয়াম-৩ পরমাণু। হিলিয়াম-৩-এর দুটো পরমাণু বিক্রিয়া করে হিলিয়াম-৪ ও দুটো হাইড্রোজেনের পরমাণু তৈরী করে। এই হাইড্রোজেনের পরমাণু দুটো আবার নতুন করে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া কিন্তু সহজে হয় না—এর জন্য চাই প্রায় দশলক্ষ ডিগ্রী কেলভিন উষ্ণতা (শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা ২৭৩ ডিগ্রী কেলভিন উষ্ণতার সমান)। এই চক্রের উৎপাদিত শক্তিই সূর্যের শক্তির উৎস এবং এই চক্রই উৎপাদিত শক্তির সমতা রক্ষা করে।

আরও বেশী উষ্ণতায় আরও একটা বিক্রিয়া চক্র তৈরী হয়। এই চক্রের নাম হল নাইট্রোজেন-কার্বন চক্র, কারণ এই চক্রে নাইট্রোজেন ও কার্বন উভয়েই অনুঘটকের কাজ করে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। এই চক্রের একটা বৈশিষ্ট হল এই যে একটা হাইড্রোজেনের পরমাণু যদি এই চক্রে ঢোকে, তবে তার হিলিয়াম হয়ে চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগে—(পাঠক, দমবন্ধ করে নিন)—৫০ লক্ষ বছর। খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই নয়,—কি বলেন ? তা সত্ত্বেও আমরা অফুরন্ত শক্তি ও আলো পেয়েই যাচ্ছি সূর্যের থেকে। এর কারণ হল সূর্যের মধ্যে এত বেশী পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে যে এই রকম অতি শ্লথগতিতে এই চক্রে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও, এই নাইট্রোজেন-কার্বন চক্র নিজের চরিত্রে অত্যন্ত কুশলতা ও দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে সূর্যের অফুরন্ত শক্তির তাঁড়ারের সমতা রক্ষা করে আসছে।

বাস্তবিক সূর্য এক অফুরন্ত শক্তির খনি। চিন্তা করুন, প্রতি সেকেণ্ডে এই সমস্ত আভ্যন্তরিক পারমাণবিক বিক্রিয়ার জন্য সূর্য ৪·৫ লক্ষ টন ভর হারাচ্ছে, বদলে দিচ্ছে অতিশক্তিশালী এক বিকিরণ স্রোত। আরও অশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে আমাদের পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ বিকিরণ স্রোত এসে পৌঁছায় তা মোটে দু'কেজি ভরের সমান—এবং সূর্যের এই দু'কেজি ভরই পৃথিবীর সমস্ত জীব-জগৎকে, গাছপালা, প্রাণী, পতঙ্গ, মানুষ, জলজ জীব ইত্যাদি সবাইকে, যোগান দিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শক্তি।

সমস্ত জীব-জগৎ,—মানুষ থেকে আরম্ভ করে গাছপালা পর্যন্ত,—সৃষ্টির কাজে সূর্যের অবদান অসীম। আমরা মানুষেরা এবং প্রাণী-জগৎ অবশ্য সোজাসুজি ভাবে সূর্য শক্তিকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি না। তবে আমাদের চামড়ার উপর সূর্যের আলোর প্রতিক্রিয়া কিছুক্ষণ রোদে ঘোরাঘুরি করলেই বেশ বোঝা যায়। গাছপালাদের কথা আলাদা। তারা সূর্য শক্তিকে সোজাসুজি নিজেদের কাজে লাগাতে পারে এবং আমাদের পরোক্ষভাবে গাছপালার উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় সূর্যশক্তিকে আমাদের শরীরের কাজে লাগানোর জন্য। অন্ধকারে গাছের পাতা পাতলা ও হলুদ হয়ে যায় ও পাতার স্বাভাবিক উজ্জলতা নষ্ট হয়। গাছও নেতিয়ে পড়ে।

গাছের পাতায় এক অত্যন্ত জটিল সবুজ রাসায়নিক পদার্থ আছে। তার নাম হল ক্লোরোফিল (Chlorophyl)। ক্লোরোফিলের কাজ হল গাছকে শক্তি জোগান। আসলে ক্লোরোফিল সূর্যের আলো ও জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বায়ুর কার্বনডাই অক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে। এই কার্বোহাইড্রেটই গাছের আহার ও শক্তি জোগায় এবং পরোক্ষভাবে প্রাণী-জগৎকেও আহার ও শক্তি জোগায়। শুধু তাই নয় বিষাক্ত কার্বনডাই অক্সাইডকে শোষিত করে পরিবর্তে অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে পরিশোধিত করে তোলে। চিন্তা করুন একটা কারখানার কথা যেখানে সোডা, পেট্রল, সোরা (পটাশিয়াম নাইট্রেট), সূর্যের আলো ইত্যাদি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যন্ত্রের একদিকে আর যন্ত্রের অন্যদিকের বিভিন্ন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে রাশিরাশি রুটি, সন্দেশ, চিনি ইত্যাদি। ব্যাপারটা রূপকথা মনে হতে পারে—তবে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে গাছের পাতার মধ্যে ও অবশেষে শরীরের মধ্যে অনেকটা এই ধরণের বিক্রিয়াই হয়।

আমাদের পৃথিবীর উপর বায়ুমণ্ডল প্রায় স্বচ্ছ এক আবরণ—ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের সমস্ত অণুই সূর্যের এই অসীম বিকিরণ রশ্মির সান্নিধ্য লাভ করছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অণুর উপর এই বিকিরণ রশ্মির বিক্রিয়া হয়ে চলেছে এবং এই বিকিরণ রশ্মির সান্নিধ্যেই বায়ুমণ্ডলে নানা প্রকারের আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে।

আলোক রসায়নে বিক্রিয়ার ধরণটা কি রকম? সূর্যের আলো থেকে বিকিরিত রশ্মিগুলো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে বায়ুমণ্ডলের অণুগুলোর সঙ্গে ক্রমাগত হাতাহাতি করে চলেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু আলোকরশ্মি তার শক্তি সহ অণুর মধ্যে ঢুকে পড়ে বা শোষিত হয় ও তার নিজের শক্তি অণুর ভেতরের ইলেকট্রনকে দিয়ে ইলেকট্রনটিকে বা একাধিক ইলেকট্রনকে তাদের নিজের রাস্তা থেকে আরও বেশী শক্তিসম্পন্ন রাস্তায় নিয়ে যায়। অণুর এই অবস্থাকে উত্তেজিত অবস্থা বলে। যখনই একবার কোন অণুকে এই উত্তেজিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় তা বিকিরণ রশ্মির শোষণের দ্বারাই

হোক, বা কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারাই হোক, কিম্বা নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘর্ষের দ্বারাই হোক না কেন,—বেশ কয়েক ধরণের রাস্তা আছে এই উত্তেজিত শক্তির প্রশমনের জন্য। যেমন ধরা যাক।

অক্সিজেন অণু (উত্তেজিত)—অক্সিজেন অণু + ফোটন এই ধরণের বিক্রিয়ার ফলে উত্তেজিত অক্সিজেন অণু তার পূর্বের সর্বনিম্ন শক্তির স্তরে নেমে যায় ও একটি ফোটন বেরিয়ে আসে। এই বিক্রিয়াকে লুমিনেসেন্স (Luminescence) বলা হয়। লুমিনেসেন্সের জন্যই বায়ুমণ্ডলে হালকা আলোর রক্তিমাভা দেখা যায়। উত্তেজিত অণুটি আবার নিজেও আলোক-আয়নিত (photo ionised) হতে পারে বা তার আলোক-বিযুক্তিকরণ ঘটতে পারে। উপরিউক্ত উভয় বিক্রিয়ার ফলে সহজেই বিক্রিয়া করতে সক্ষম উত্তেজিত অণু তৈরী হয় যারা আবার অন্য কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম অথবা বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দ্রুত সংঘটিত করতে সক্ষম।

সূর্য আমাদের সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহকে অনাদিকাল হতে আলো দিয়ে চলেছে। আজ আমরা সূর্যের আলো ছাড়াও বিজ্ঞানের দৌলতে আরও বিভিন্ন রকমের আলো দেখতে অভ্যস্ত,—তবে চুপিচুপি জানিয়ে রাখি যে সব রকমের আলোর উৎপত্তিই হল সূর্যের থেকে। সূর্যের আলোয় সাতটা রঙ লুকিয়ে আছে। তারাই বিভিন্ন জিনিষের উপর পড়ে বিচ্ছুরিত হয়ে নানা রঙের জিনিষ হয়ে ধরা পড়ছে আমাদের চোখে। আমার, আপনার এবং আমাদের সবাইকার চোখের মধ্যেও এক সৌর রসায়ন চলছে—একথায় হয়ত এ মুহূর্তে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ ইতিমধ্যেই 'এলিস' হয়ে আপনি সৌর রসায়নের মহাবিস্ময়কর জগতের অনেকটাই ঘুরে ফেলেছেন। আবার বলি, আধুনিক বিভিন্ন ধরণের আলোর কথা এখানে আমরা ধরছি না,—ধরছি সেই আদি ও অকৃত্রিম সূর্যালোককেই; যদিও একথা সত্য যে সূর্যালোক ছাড়াও অন্যান্য আলোতে আমরা দেখতে পাই। আমাদের চোখের মধ্যে রেটিনা নামে এক আলোক সুগ্রাহী পর্দা আছে—ঠিক ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার প্লেটের মত। এই রেটিনাতে রোডপ্সিন নামে এক রঙীন ও অত্যন্ত আলোক সুগ্রাহী রাসায়নিক পদার্থ আছে। রোডপ্সিনের উপর আলো পড়লেই তা ফিকে হতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়া বেশ কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হয় ও রোডপ্সিন একটি রেটিনালের (Retinal) অণু ও একটি প্রোটিনের অণুতে রূপান্তরিত হয়। মধ্যবর্তী কোন এক ধাপে আলোক-সুগ্রাহী নার্ভ উত্তেজিত হয় ও বস্তুর ছায়া আমরা দেখতে পাই। রেটিনাল ভিটামিন-এ থেকে শরীরের মধ্যে তৈরী হয়। পরবর্তী কয়েক ধাপে উদ্ভূত প্রোটিন রেটিনালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার সুগ্রাহী রঙিন রাসায়নিক পদার্থ রোডপ্সিন তৈরী করে।

একধরণের সামুদ্রিক শামুক পাওয়া যায় ভারত মহাসাগরে, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এবং ইউরোপ ও আফ্রিকায়। কানের মত দেখতে বলে একে ear-shell বা Abalone বলা হয়। এর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু বলে বহুজায়গাতেই একে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়—কোথাও পুরোপুরি এবং কোথাও কিছু অংশ বাদ দিয়ে। যেখানে পুরোপুরি অর্থাৎ কোন অংশ বাদ না দিয়েই এর মাংস খাওয়া হয় সেখানে এক ধরণের বিষক্রিয়া মাঝেমধ্যে দেখা গেছে। হঠাৎ সারা শরীর জলতে

থাকে. চুলকানি শুরু হয়, চামড়া লাল হয়ে যায় এবং অবশেষে চামড়ায় ক্ষত তৈরী হয়। একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে এর বিষক্রিয়া কেবল সূর্যালোকেই হয়, শরীরে জামাকাপড় থাকলে কেবল যে অংশে সূর্যের আলো পড়ছে সেখানেই চুলকানি শুরু হয়।

পাঠক, এটা কিন্তু আপনাকে মইয়ে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া নয়। সৌর রসায়নের এও এক বিচিত্র দিক্। আপনি চেষ্টা করলেও রসায়নবিদ্ সূর্যকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। শুধু আমাদের পৃথিবী বা আমাদের সৌরজগৎ নয়—সমস্ত মহাবিশ্বের সমস্ত সূর্যেরই নিজস্ব রসায়ন আছে। আমাদের পৃথিবীর মত মহবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণ আছে কিনা এ বিষয়ে আমি যেতে চাই না—কারণ ব্যাপারটায় তর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং তা প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে মহাবিশ্বের যে সমস্ত জায়গাকে আমরা মহাশূন্য বলে ভাবতাম সেখানেও নানা ধরণের জৈব ও অজৈব অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মহাকাশের কোথাও হয়ত প্রাণ আছে, বা প্রাণ গড়ে উঠছে। এসব আগামীবিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিষয়বস্তু। আসুন, আমরা বরং আগামীদিনের বিশ্বকে সেই শাশ্বত বাণী শুনিয়ে রাখি—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ মে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

ভারত চীন ও চীন ভারত পরিব্রাজকবৃন্দ—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। সাহিত্য সংসদ: কলিকাতা-৯, ১৯৭৭, স্থান নির্দেশ, কালক্রম, নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী, রেখাচিত্র ও মানচিত্র সহ, মূল্য: দশ টাকা।

মানব সংস্কৃতি বা সমাজভিত্তিক সংগঠিত জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উপায় ও পদ্ধতিনির্ভর কৃষ্টি কোন প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠতে পারে নি। উপরিউক্ত কারণে কৃষ্টি বিনিময়ের পদ্ধতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করলে আমাদের পক্ষে পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে মানবকৃষ্টির একটা সামগ্রিক ও সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি হতে পারে। এশিয়া ভূখণ্ডের সুবিস্তৃত ভৌগোলিক প্রসারতায় ভারতীয় উপমহাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় এবং চীনদেশ সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় মানবকৃষ্টির উত্থান-পতনের বৃহত্তম কেন্দ্ররূপে গণ্য। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায় এই দুই কৃষ্টি কেন্দ্র প্রভাবিত অঞ্চল সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনের কৃষ্টি সংযোগের কথা ভারত ও চীন উভয় দেশের পক্ষেই মঙ্গলকর ও গভীরভাবে শিক্ষাপ্রদ। প্রধানত খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যে ভারত ও চীনের মধ্যে বিপুলাকার ও বিরাট পরিধির কৃষ্টি বিনিময়ের তথ্য পাওয়া যায়। এর পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত ছিল।

প্রধানতঃ ভারতীয় উপমহাদেশ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে পণ্ডিত পরিব্রাজকদের চীনদেশ পরিভ্রমণ ও চীনে অবস্থানের ও শিক্ষাচর্চার মাধ্যমেই এই সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের যাতায়াত এই দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি করেছিল। যাওয়া আসা চলেছিল উত্তরের পর্বতসঙ্কুল ও ভয়াবহ মরুভূমির মধ্যে স্থিত একাধিক মরুদ্যানের ও ব্যবসায় কেন্দ্রের খুঁটি অবলম্বন করে। দক্ষিণে পথ চলে গিয়েছিল উপকূল থেকে উপকূলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ স্পর্শ করে।

বৌদ্ধ জীবনবাদ ও মানবিক দৃষ্টি নিঃসন্দেহে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সৃষ্টি করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে গভীর ও অধীর আগ্রহের। উত্তর-পূর্ব ও উত্তরে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধ মতের উদার দর্শন ও শিল্পদৃষ্টি প্রভৃতিও ভারত সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেছিল দূরদেশের মানুষকে।

চীনদেশ থেকে এরপরে সুরু হয়েছিল অভিযাত্রী আগমনের। হয়ত শতশত অভিযাত্রীর মধ্যে এখন আমরা নাম ও বিবরণ পাই অতি অল্প কয়েকজনের। এঁরা সহস্র যোজনপথ কেবল জল ও স্থল পথে অতিক্রম করেছিলেন তাই নয়। ভারতে এসে তাঁরা স্থানীয়ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ভারতীয় জীবনযাত্রাকে নিকট থেকে দেখে তার পরিচয় ও বিবরণ রেখে গেছেন। এমনকি একদিকে যেমন দর্শনচর্চা করেছেন ও মূলগ্রন্থাদির চৈনিক অনুবাদ করেছেন তেমনই অন্যদিকে চর্চা করেছেন ভারতীয় শিল্পকলা ও চিত্রবিদ্যার।

ভারত-চীন কৃষ্টি প্রাঙ্গণের আলোচনার আজ অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন থাকলেও এদিকে কোন একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা বহুকাল দৃষ্ট হয় নি। সেদিক থেকে শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের ভারতীয় ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকদের বিবরণ গ্রন্থটিকে একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলে অবশ্যই অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের আমাদের বর্তমানে আলোচ্য পুস্তকটির মূল্য আরও একটি কারণে অপরিসীম কারণ এযাবৎ ভারত-চীন কৃষ্টি বিনিময়ের কথা কয়েকটি অতি দুষ্প্রাপ্য য়ুরোপীয় ভাষার গ্রন্থে আবদ্ধ হয়ে থেকেছে এবং কিছু কিছু অতিপণ্ডিতের গুরুগম্ভীর কথাবার্তা ও অহেতুক বাক্য বিনিময়ের উপাদান হয়ে সাধারণের আয়ত্তের বহির্দেশে থেকেছে। আজ বাংলায় লিখিত এই গ্রন্থটির প্রকাশকে আমরা অকুণ্ঠ সধর্ধনা জানাতে পারি। বইটি পড়লে এর সুপরিচ্ছন্ন অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সহজভাষা আমাদের আকৃষ্ট করে। একটি প্রারম্ভিক ভূমিকায় ও 'পূর্বাভাষ' নামাঙ্কিত অধ্যায়ে লেখক সহজ সাবলীলতায় পরিপ্রেক্ষিতকে উপস্থাপিত করেছেন। সমগ্র পুস্তকটির মূল অংশ কালানুক্রমিকভাবে ভারতীয় উপ-মহাদেশে আগত চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণের দ্বারা সমৃদ্ধ। শেষ অধ্যায়টির ঠিক পূর্বে চীনদেশে ভারতীয় ও ভারতীয় ভাবধারার বাহক অন্যান্য পণ্ডিত পরিভ্রমণকারী ও আচার্যদের বিবরণ একত্রিত।

আমাদের দেশের পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নির্ঘণ্ট ও অন্যান্য তথ্যপঞ্জী অবহেলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি এর এক উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। এই গ্রন্থে উত্তরের ও দক্ষিণের ভারত-চীন সংযোগপথ হিউয়েনসাঙ্ ও ফাহিয়েন সম্পর্কিত মানচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত। গ্রন্থটি বাংলাভাষায় কাজেই গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রথমোক্তজনের ভ্রমণ পথের মানচিত্র আমাদের নিকট অতি মূল্যবান। পরিশিষ্ট দুটিতে রক্ষিত নামের নাম সূচী ও পরিচায়িকাতে গ্রন্থকারের অধ্যবসায় শ্রমের পরিচয়ের চিহ্ন আছে। এই অংশে মূল চীনা নাম এবং তার ভারতীয় তথা মূলরূপ ও ভারতে ঐ স্থানটির রাজ্য ও জেলাভিত্তিক অবস্থিতির পরিচয় দান করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক কালানুক্রমকে অনুধাবন করলে আমাদের নিকট এশিয়ার কৃষ্টির কয়েকটি বিশেষ দিক চোখে না পড়ে পারে না। গুপ্তযুগের সময়ে ভারত থেকে চীনে বৌদ্ধজীবন দর্শনের প্রাথমিক সংযোগ হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। পূর্ব-মধ্য এশিয়ার সুপরিচিত 'মীরন' কেন্দ্রটি ও সুবিখ্যাত তুনহুয়ানের সূচনা হয়েছিল এর কয়েক শতাব্দী পরেই। পরে এসেছে লুঙ্‌মেঙ্গ গুহাকীর্তি, তিয়েনলুঙ্‌শাঙ্গ এবং আরও অসংখ্য জানা—আমাদের নিকট অজানা সৌধাদির কথা। প্রধানতঃ পরবর্তী 'হান' 'ষড় রাজবংশ', উত্তর-ওয়েই রাজবংশ তাং রাজবংশ পঞ্চরাজবংশ ও সুঙ্ রাজবংশ তারপর পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। ভারত এবং চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্টি অবদানের কাল এই সহস্রাধিক বৎসরের পরিধিটিকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। বেশভূষায়, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্য ভাষা ও সাহিত্যে ভারত ও চীনদেশের কৃষ্টিমূলক বিনিময়ের কথা নিয়ে এপর্যন্ত খুব একটা সুপরিকল্পিত আলোচনা হয় নি। সাম্প্রতিককালে এই বিষয়ের অনুসন্ধিৎসুরা প্রধানতঃ ডিয়েট্রিখ শেকেল ও তাঁর পূর্বে প্রকাশিত উইলিয়ম উইলেট্‌স এর পুস্তকদ্বয়ের উপর নির্ভর করে এসেছেন। লিডহ্যাম, ডেভিড্‌সন, শেফার সোপার, রাইট এঁদের লেখা চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লিখিত।

মাঝে মাঝে ভারত-চীন কৃষ্টি ক্ষেত্রের উৎসাহীদের কাছে কয়েকটি উল্লেখ্য অনুমান উপস্থাপিত

হয়েছে মাত্র। ভারহুত সাঁচী তথা প্রাচীন মথুরার পাথরে নির্মিত কিন্তু কাঠের কাজের পদ্ধতিতে গ্রথিত স্তূপ তোরণের সাদৃশ্য লিওনার্ড উলী প্রমুখের মনে সম্ভাবনাময় মত নির্দেশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্তূপ তথা ভারতীয় স্মারক স্থাপত্য চীনা স্থাপত্যের বহিরাঙ্গ ও বিবর্তনের পরস্পর নির্ভরতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চীনাংশুক এবং চীনাবস্ত্র শিল্পের অন্যান্য দিকের কথা, চীনামাটির কাজ, কাঠের উপর লাক্ষার কাজ ও চিত্রায়ণ প্রভৃতি কারুকর্মের চীন-ভারত কৃষ্টিক্ষেত্রের পর্যালোচনা আজও বহু আলোচিত আলোকপাতে সক্ষম হতে পারে।

যদি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাই তাহলে অভিধান গ্রন্থনের ক্ষেত্রে, ভারতীয় নামের চীনারূপদানের ক্ষেত্রে এবং প্রাচীন চৈনিক রচনা পদ্ধতিতে ভারতীয় রচনা রূপপরিবর্তনের অন্তর্নিহিত গবেষণার মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের ধ্বনি-বিজ্ঞানের নবতর তথ্যাদি উদ্‌ঘাটিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিষয়টিতে গভীরতর ও যথার্থ অর্থবহ কাজ চালাতে গেলে চীনদেশে ও ভারতে অধুনা প্রাপ্তব্য সমস্ত চীন-ভারত কৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত পুথির একটি পূর্ণাঙ্গ ও সটিক তালিকা প্রণয়নের দরকার। সরকারী পর্যায়ে নিযুক্ত একটি যৌথ পরিষদ চীন পরিভ্রমণ করে চীনে স্থিত মূলভারতীয় ভাষার অথবা মূলভারতীয় ভাষার পুথির চীনারূপান্তরের সমীক্ষা করতে পারেন। এর সঙ্গে চীনের গ্রন্থাদিতে স্থিত চীনা ভারত পরিভ্রমণকারীদের বিবরণ ও জীবনী এবং চীনস্থিত ভারতীয়দের জীবন কাহিনীর উল্লেখাদিরও সুগ্রথিত সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারলে উত্তম হয়।

একটা কথা চীন-ভারত কৃষ্টি বিনিময়ের আলোচনায় বার বার এসে পড়ে। চীন থেকে শুধুমাত্র পণ্ডিতেরাই ভারতবর্ষে আসেন নি। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সাধারণ অনুচরবৃন্দ। তাঁরা হয়ত কেউ ছিলেন কারিগর, কেউবা অশ্বচালক, পরিচারক, দোভাষী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী। হয়ত ভারত থেকে চীনেও এইপ্রকার অনেক সাধারণ লোক গিয়েছিলেন। আর স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রেণীর লোকের মাধ্যমেই ভারতীয় সভ্যতার ব্যবহারিক তৈজস নিদর্শনের প্রভাব পড়েছিল ভারতে। সামাজিক ইতিহাসের এই বিশেষ দিক আজও অনালোচিত।

খৃষ্টীয় কালগণনার প্রাক্কালে 'দেবপুত্র' রাজকীয় উপাধিটির সঙ্গে চীনের রাজকীয় উপাধির সাদৃশ্য দেখা যায়। মধ্যএশিয়ার চির ভ্রাম্যমাণ জাতি-উপজাতির মধ্য দিয়ে কুষাণ, পার্থীয়, সাসানীয় ও তৎপরবর্তী মঙ্গোল তুর্ক মুঘলযুগেও চীনের কৃষ্টি সরাসরি অথবা অন্যদের দ্বারা বাহিত হয়ে বিশেষ করে পারস্যের ও পরোক্ষে ভারতের দরবারী চিত্রকলায় 'কার্পেটে' সাধারণ বস্ত্রসম্ভারের নক্সায়, চীনামাটির কাজের তৈজসে ও স্থাপত্য-আবরক অপূর্ব বর্ণমিশ্রণের সৃষ্ট চীনামাটির ফলকে। কাগজের ক্ষেত্রেও এই দান বহু আলোচিত।

আমরা জানি চৈনিক পথিকৃৎদের প্রাচীন ভারত বিবরণ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান। ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ব্যবস্থা আচার ব্যবহার প্রভৃতি কোন কিছুই এর থেকে বাদ পড়ে নি। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম থেকে সুরু করে আজও আমরা ভারতের বহুবিখ্যাত জনপদকে কেবলমাত্র চৈনিক বিবরণের সাহায্যেই নির্দিষ্ট করে জানতে সমর্থ হয়েছি। হিউয়েনসাঙ্ হতে মাহুয়ান পর্যন্ত পরিভ্রমণকারীদের বিবরণ ভারতের ক্ষেত্রে ও বিশেষ করে বাংলার সুপ্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। মাহুয়ানের বর্ণনায় অর্থ নৈতিক অবস্থার

সুন্দর বর্ণনা ও স্থানীয় জনসাধারণের কথা জানতে পারা যায়।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা সুপ্রাচীনকালে গৌড়দেশের ও বরেন্দ্রভূমির সমতটের এবং বঙ্গের এবং রাঢ় ও সুহ্মদেশের বহু অঞ্চলে একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। একথা আমাদের কাছে অতি কৌতূহলোদ্দীপক যে ফা-হিয়েন বলেছেন যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র ধর্মকেন্দ্রের কথাই ভারত-চীন কৃষ্টির অধ্যায় শেষ হয় নি।

ভারতের নৃতত্ত্বে তথা লোকজীবনে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথাও একটি আলোচিত হবার মত বিষয়। সিকিম ভূটান অরুণাচল অঞ্চলে একাধিক স্থানীয় সংস্কৃতিতে ও বস্তুভিত্তিক কৃষ্টি-উপাদানে যুগপৎ স্থানীয়, উপজাতিক ভারতীয় ও চৈনিক ভাবধারার গভীর পরিমিশ্রণের একাধিক চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। একথা মনে রাখতে হবে যে চীনের সঙ্গে কৃষ্টিবিনিময় উপজাতিক স্থানান্তরনও বিস্তৃত পরিভ্রমণের মাধ্যমে দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ইউনান ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল উত্তরব্রহ্ম তাই ভূমি ও ভিয়েৎনাম উপত্যকাঞ্চল একই ক্রমপ্রবাহের সংস্কৃতির স্রোতে পরস্পরযুক্ত। নেপালের পাহাড়ী এলাকায় কাঠমণ্ডো উপত্যকা ও তরাই ও উত্তরবঙ্গের লোককলা ও কারুকৃতিতে এর চিহ্ন পর্যালোচিত হবার যোগ্য বিষয়। তিব্বতীয় জীবনে চীন-ভারত কৃষ্টির স্রোতধারা নিবিড়ভাবে মিশ্রিত হয়েছে চারু ও কারুশিল্পে, কাহিনী, কিম্বদন্তী, ও সাহিত্যে লোককথায়। এতে অবশ্য সাধারণভাবে সমগ্র ভারতের সামগ্রিক ও বিশেষভাবে পূর্ব-ভারতের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত

বৌদ্ধ ধর্মপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চীনে তথা পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় জাতক কথা, মহাকাব্য, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রচারিত হয়েছে। এর কোন কোন দর্শনীয় শিল্পায়নও চীনদেশে চোখে পড়েছে। আসলে ভারতের সমগ্র লোককাহিনীতে যে স্বচ্ছ জীবন দৃষ্টি রয়েছে তা, সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় জনসাধারণের সর্ববৃহৎ অংশ কৃষিজীবী মানুষের যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে চীনদেশের জনজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা নির্ভর কোন উপাদান ভারতের লোক জীবনে আছে কিনা সেটি আমরা সঠিক জানি না। চীনের কাহিনীতে 'পশ্চিমের দেশ' এক সুন্দর আদর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছে চৈনিক সাহিত্যের ও উপকথার একাধিক প্রদীপ্ত বুদ্ধি অকুতোভয় মানুষ ও মনুষ্যেতর চরিত্রকে। পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধ এককালে ভারতমুখীন অভিযাত্রার সূচনা করেছিল। অন্যদিকে চীনও এসেছিল ভারতে মানসিক অনুসন্ধিৎসার ও ব্যবহারিক কাজের প্রয়োজনে। ভারতে মিলিত হয়েছিল প্রাচীন পৃথিবীর সুবিখ্যাত 'সিল্ক-রাজপথ' সমগ্র মধ্য উত্তর এশিয়ার মাধ্যমে। কাজেই আজ ভারতের পক্ষে বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় চীন সংযোগ ও চীনচর্চার প্রয়োজন য়ুরোপচর্চার মতই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধেয় লেখক আমাদের ভাবিয়ে তুলেছেন যে আমাদের 'চীনাভবন' আছে, কলিকাতা প্রভৃতি শহরে উচ্চ বিদ্যার উচ্চতর কেন্দ্রে চীনভাষায় আঁচড় কাটার মত শিক্ষাদান করা হয় ইত্যাদি। কিন্তু এসমস্ত অবশ্যই যথেষ্ট নয়। এর আগে সুপণ্ডিত প্রবোধচন্দ্র বাগচী চীনভারত সম্পর্কাদি নিয়ে বাংলায় আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

বহুদিন গত হল সংস্কৃতি বিনিময় ও কৃষি সম্প্রসারণ ও বিস্তার নিয়ে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত। অন্যদিকে গর্বান্ধ দৃষ্টি নিয়ে—ভারতই সকলকিছুর কেন্দ্র—এই মনোভাবকে বাড়তে দেওয়াই আজকের একাধিক লেখকের একমাত্র উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত তথা বাংলার মানবকৃষ্টি অবশ্যই

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতম কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু এই কেন্দ্রস্থল গ্রহণ ও দানের এবং কৃষ্টিমূলক যাওয়া আসার আলোকেই প্রোজ্জ্বল। চীনের তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর কৃষ্টির বেলাতেও কথাটি অমোঘভাবে সত্য।

প্রাগৈতিকহাসিক যুগেও ভারতের সঙ্গে উত্তর ও পূর্ব এশিয়ার যে যোগাযোগছিল সেকথার ইঙ্গিত কাশ্মীরাঞ্চলের অতি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের গড়নের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায়। কাশ্মীরের নব্য প্রস্তরীয় যুগের মাটির তলায় বাসগৃহ সম্বলিত মনুষ্য বাসস্থলের রীতি-প্রকৃতি যেটা গুফ্‌কাল ও বুরুজাহোম প্রভৃতি কেন্দ্রে পাওয়া গেছে তার জীবন যাত্রার পদ্ধতি উপাদান ও তৈজস এবং মৃৎপাত্র চীনদেশের প্রত্যন্তের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের স্কন্ধ বিশিষ্ট কুঠার নব্যপ্রস্তরের যুগের একটি প্রামাণিক নিদর্শন। এই অতিপ্রয়োজনীয় হাতিয়ারটিরও কৃষ্টিমূলক সংযোগ উত্তর-পূর্ব-ভারত থেকে আরও পূর্বদিকে চলে গেছে চীনেরই দিকে। মহাপ্রস্তরীয় সমাধির কথাও খানিকটা একই রকম।

আজকের দিনের পশ্চিমবঙ্গে চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ মেদিনীপুর জিলার তমলুক বা প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবহ। হিউয়েনসাঙের লেখায় আমরা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহস সম্পর্কে জানতে পারি। জানা যায় আরও যে এখান থেকে জলপথেও স্থলপথে বাণিজ্য হত দূর-দূরান্তে। ফা-হিয়েন এর লেখায় জানা যে তিনি এখানে ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেছিলেন। ইৎসিঙ তাম্রলিপ্তে তা-চেঙ-তেঙ নামক চীনা পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পান যিনি বারো বৎসর তাম্রলিপ্তে অবস্থান করেন ও এঁর কাছ থেকে ইৎসিঙ সংস্কৃতিভাষা শিক্ষা করেন। তাং নামক চীনা পণ্ডিত ব্রহ্ম ও সিংহল হয়ে তাম্রলিপ্তে এসে বারো বৎসরকাল সংস্কৃত শিক্ষা করে এই ভাষায় প্রশংসনীয় বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। হুইলুনের বিবরণে সমুদ্রপথে চীনদেশ যাওয়ার জন্য তাম্রলিপ্তের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে। তাও লিন নামে আর একজন পর্যটক তাম্রলিপ্তে আগমন করে তিন বৎসরকাল সংস্কৃত শেখেন। হুই-তা নামে আর একজন জ্ঞানান্বেষী মালয় থেকে তাম্রলিপ্তে এসে অর্ধ-বৎসর সংস্কৃত শব্দ বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাম্রলিপ্ত তথা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ যে প্রাচীনকালে এশিয়ার কৃষ্টিধারার সঙ্গমস্থলের কাজ করত সেকথা অস্বীকার উপায় নেই। এই প্রমাণিত কৃষ্টিকেন্দ্রের গুরুত্ব বিবেচনা করে একথা দুঃখ জনক যে আজও তমলুক ভারতীয় প্রত্ন-সমীক্ষা কর্তৃক বহুদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আছে যদিও এখানে থেকে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন প্রত্ন নিদর্শনের কোন অভাব নেই। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাত্র দু'বার এখানে উৎখনন অত্যন্ত সীমিতভাবে পরিচালিত হয়েছে মাত্র। এই কেন্দ্রটির সঙ্গে নালন্দা বোধগয়া সমতট ও মধ্যবঙ্গ মধ্যভারত ও দক্ষিণে সিংহল অবধি যাওয়া চলেছিল। এটা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক যে কলিকাতা তথা পূর্ব ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন চৈনিক ভাষা ও কৃষ্টির কোন পূর্ণাঙ্গ ও সজীব বিভাগ নেই। চীনা ইতিহাস ও কৃষ্টি ভারতে অবহেলিত বিষয়মাত্র। যথাযোগ্য আগ্রহের অভাবে শান্তিনিকেতনস্থিত 'চীনাভবন' সজীব ও ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে সার্থক হয়ে ওঠে নি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে চীন সম্পর্কিত আলোচনা আজও দুর্বল ও প্রায় অনুপস্থিত। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের বইটি পড়ার পর মনে হয় যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীন সম্পর্কীয় বিভাগ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত স্বদেশের

ইতিহাস ও কৃষ্টিকে আরও ভালভাবে জানবার জন্য। লেখকের নিকট আমরা আরও কৃতজ্ঞ কারণ এই পুস্তক আমাদের যথার্থরূপে ভাবিয়ে তুলেছে।

ভারত এবং চীনের সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা জানাবেষণের ও মানসিকতার ভাব রয়েছে যেটি সব সময়েই অনুসরণ ও আলোচনা করার যোগ্য। শ্রদ্ধেয় লেখক বহু পরিশ্রম করে বাংলায় সেই বিষয়টির দ্বার আজ খুলে দিলেন। আমরা সর্বতোভাবে গৌরাঙ্গবাবুর এই গ্রন্থের সুপ্রচার কামনা করি এবং একাধিক পরিবর্ধিত সংস্করণ আশা করি। লেখক অনুরূপভাবে মধ্য এশিয়া ও ভারত অথবা তিব্বত এবং ভারত প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় এই প্রকারের আরও গ্রন্থ রচনা করুন এটাও আমাদের আন্তরিক আশা।

গৌরাঙ্গগোপাল বাবুর পুস্তকটি যদি কৃষ্টির অন্যান্য দিক নিয়ে ভারত-চীন সম্পর্কের বিবরণসহ একাধিক পুস্তক রচনার উৎসাহ সঞ্চার করে তবে আমাদের নিকট সেটি হবে একটি উল্লেখ্য ঘটনা।

সন্তোষকুমার বসু

বিশেষ সুযোগ

১৯৭৮ সালের রবীন্দ্র-জয়োৎসব থেকে ১৯৭৯ সালের রবীন্দ্র-জয়োৎসবের পূর্ব পর্যন্ত এক বৎসর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে সাধারণ ক্রেতা ও পুস্তক-বিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে।

১। **কুরুপাণ্ডব ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত**

বাংলা রচনারীতিতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্যতা উভয়েরই পরিচয়ের জন্য এ গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী। মূল্য ৩·০০ টাকা।

২। **বাংলা ভাষা-পরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

প্রাকৃত বাংলার যে বিশেষ রূপটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে চলেছে তারই বিশদ এবং তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করি এই গ্রন্থে করেছেন। মূল্য ৩·৫০ টাকা।

৩। **শেষ সপ্তক ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

কবির শেষজীবনে রচিত কয়েকটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে একাধারে তাঁর কাব্যের ঋতুপরিবর্তনের আর বিদায়ের সুর। মূল্য ১৩·৫০ টাকা।

৪। **সঞ্চয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ধর্মের নবযুগ, ধর্মের অর্থ, ধর্মশিক্ষা, ধর্মের অধিকার ইত্যাদি আটটি প্রবন্ধ। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবির প্রদত্ত ভাষণ। মূল্য ২·৮০ টাকা।

৫। **যা দেখেছি যা পেয়েছি ॥ সুধীরঞ্জন দাস**

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য তথা ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় জীবনের মনোরম বিবরণী। মূল্য ১৪·০০ টাকা।

৬। **রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী**

সুললিত গদ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের বিবরণ। মূল্য ১৫·০০ টাকা।

৭। **চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ ॥ শ্রীমলিনা রায়**

ভারতপ্রেমিক তথা রবীন্দ্রানুরাগী দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের বহুবিচিত্রজীবনের সরস ও সুখপাঠ্য আলেখ্য। অবনীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ-অঙ্কিত চিত্র, দু'খানি পাণ্ডুলিপি-চিত্র এবং শ্রীমুকুল দে-অঙ্কিত সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত। মূল্য ১০.০০ টাকা।

কমিশনের হার

সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০·০০ টাকা, পুস্তকবিক্রেতা শতকরা ৩০·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী